সমুদ্রমেখলা

বুদ্ধদেব গুহ

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅতি দাস

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

রুদ্রাণী এবং কৌস্তুভ চ্যাটার্জিকে

১

বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির মধ্যের চারদিকে হাজার মাইল নীলিমার সীমানা ঘেরা এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। তারই মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপ। ঘন জঙ্গলাবৃত এবং প্রায় এক লক্ষ নারকোল গাছ সম্বলিত। দ্বীপের নাম "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"। সেই দ্বীপে একা থাকেন আহুক বোস। রবিনসন ক্রুসোর যেমন ফ্রাইডে ছিল আহুক-এরও তেমনি আছে ভীরাপ্পান। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে। হিন্দী আর ইংরেজির কিছু শব্দ বলতে পারে। তবে পুরো বাক্য নয়। যারা কাজের মানুষ তারা বেশি কথার মানুষ কোনও কালেই হয় না। বেশির ভাগ সময়েই মনোসিলেবল্-এই কথা বলে ভীরাপ্পান।

তার মা থাকেন রসস আইল্যান্ডে। যখনই আহুক পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন, সে তার জলি বোট-এর মতন বোটটিকে আহুকের আউটবোর্ড এঞ্জিন লাগানো বড় বোট-এর পেছনে বেঁধে নিয়ে চলে আসে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত। তারপর নিজের বোট নিয়ে চলে যায় রসস আইল্যান্ডে। অবশ্য তার বোটেও আউটবোর্ড এঞ্জিন আছে। তবে কমজোরি। আহুককে পোর্ট ব্লেয়ারে আসতে হয় গড়ে মাসে দুবার। খাবার-দাবার জিনিসপত্র কিনতে। চিঠিপত্র যদি ক্বচিৎ আসে, তা নিতে। ডিজেল কিনতে। তাঁর ঠিকানা বলতেও বে আইল্যান্ড হোটেল, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান আইল্যান্ডস। দক্ষিণ ভারতীয় ম্যানেজার বন্ধুস্থানীয়। সব কিছুই যত্ন করে রেখে দেন। তাঁরই প্রযত্নে সব আসে। হেড অফিসের কাগজপত্রও।

ভীরাপ্পানের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। অবিবাহিত। এবং অত্যন্তই নারীবিদ্বেষী। আহুক এবং ভীরাপ্পানের সামাজিক, আর্থিক, মানসিক এবং শিক্ষাগত তল আদৌ সমান নয় বলেই এর এই নারী-বিদ্বেষের কারণ বিশদভাবে জিজ্ঞেস করেননি ওকে কখনওই আহুক। যদি করতেনও ভাষার দৈনার কারণে হয়ত বুঝিয়ে বলতেও পারত না ভীরাপ্পান। নিজে থেকে ভীরাপ্পানও কোনোদিন বলেনি। কোনও কারণ নিশ্চয়ই থেকে থাকবে। কিছু জিনিস, তা গুণই হোক, কী দোষ, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব করেই রাখতে দেওয়া উচিত।

এইটুকু স্বাধীনতা প্রত্যেক নারী ও পুরুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মানেন আহুক।

পাপ্পলাগুড্ডি ভীরাপ্পানও আহুক সম্বন্ধে সামান্যই জানে। যেমন আহুকও সামান্যই জানেন ভীরাপ্পান সম্বন্ধে। দুজনের মধ্যেই মালিক-কর্মচারী সম্পর্কের বাইরের এই যে কিছু রহস্য আছে, কিছু অজানা তথ্য, না-বলা-কথা, এতে আহুক খুবই স্বস্তি পান। হয়ত ভীরাপ্পানও পায়। নিজস্ব দোষ-গুণেরই মতন প্রত্যেক মানুষেরই কিছু রহস্যও,

নিজস্ব করে রাখা অবশ্যই উচিত বলে আহুক মানেন। ওঁদের দুজনের কেউই অন্য জন সম্বন্ধে অত্যধিক কৌতূহল পোষণ করেন না। যেটুকু না জানলে চলে না, সেটুকুই জেনে নেন, নিয়েছেন। তাতেই খুশি দুজনেই।

রবিনসন ক্রুসো এবং ফ্রাইডে।

তবে আহুক পোর্ট ব্লেয়ারে না গেলেও ভীরাপ্পান প্রতি শনিবার ভোরে চলে যায় রসস আইল্যান্ডে আবার চলে আসে রবিবার বিকেলে। তার বৃদ্ধা অশক্ত মাকে নিয়ে অবশ্যই চার্চ এ যায় সে। নারীবিদ্বেষী হলেও এমন মাতৃভক্ত মানুষ বেশি দেখা যায় না।

ভীরাপ্পান আগামীকাল বিকেলে ফিরে আসবে "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ। মায়ের কাছে দুপুরের খাওয়া সেরে রওয়ানা হবে রসস আইল্যান্ড থেকে। আকাশের অবস্থা খারাপ থাকলে বা আবহাওয়া দপ্তর পতাকা ওড়ালে ওর সেদিন আর আসা হয় না।

এখানের জীবনে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ওদের সম্পর্কটাও প্রভু-ভৃত্যের নয়। মালিক-কর্মচারীর হলেও সম্পর্কটা সমান সমান। পশ্চিমী দেশের এইরকম সম্পর্কেরই মতন। আহুকের তরুণী মালকিন চুমকির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং পারস্পরিক সম্মানের উপরে বাঁধানো। বাঁধন কিছু যদি বা থাকেও, অদৃশ্য বাঁধন, তাও ফস্কা-গেরো। দু পক্ষের এক পক্ষ টান মারলেই যাতে খুলে যায়, তেমন করেই বাঁধা।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। সেই যে বড় টুনা মাছটা, আহুককে ঘুরিয়ে মারছে আজ তিন মাস হল, তার জন্যে আজও প্রথম বিকেলেই তাঁর ক্যাটাম্যারনটি ভাসিয়ে মাঝসমুদ্রে এসে পৌঁছে হুইল-লাগানো বড় ছিপটা ফেলে বসে আছেন। এই বোট-এর এঞ্জিনটা মাঝে মাঝেই রক্ষিতাদের মতন বেইমানি করে। মাঝসমুদ্রে এই বেইমানি যে কোনও দিনই প্রাণহানির কারণ হতে পারে। যুবক বয়সে পাঁচ-দশ মাইল সাঁতরে যাওয়া কিছুই ছিল না তাঁর কাছে কিন্তু যৌবন, এমনকি আহুক বোস-এর যৌবনও চিরস্থায়ী নয়। তখন যা যা পারতেন বা করতেন অবহেলে এখন আর তা পারেন না। পারেন না বলে এবং এই অমোঘ নিয়তিকে মেনে নিতেও পারেন না বলে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি ওঁর এক দুর্মর অভিমান আছে। যৌবন যদি চিরদিন নাই থাকল তবে সে দান আদৌ দিলেন কেন তিনি? এখন না আছে, মনের প্রেম, না শরীরের প্রেম, না যৌবনের দম্ভ। মাঝে মাঝেই এই জীবনকে দুর্বিষহ বলে মনে হয়। নিজের শর্তে না বাঁচলে বেঁচে কি লাভ? তাই আজকাল আত্মহত্যার ইচ্ছাটা কেবলই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

গোলাপি-রঙা নাইলন এর লাইন আছে বহু লম্বা। বঁড়শি একবার গিললে চব্বিশ ঘণ্টা লাগুক কী আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগুক সেই টুনাকে তিনি তুলবেন ঠিকই। ফাত্‌নাটাও মস্ত বড়। এক অ্যামেরিকান সাহেব, তাঁর মালকিনের অতিথি হয়ে গত বছর এসেছিলেন এখানে, তিনি উপহার দিয়ে গেছেন। গাঢ় লাল রঙা ফাত্‌না। সাহেবরা বলে Float। মাঝে মাঝে কোনও কুতূহলী বড় হাঙ্গর ফাত্‌নাশুদ্ধ লাইন কেটে নিয়ে

যায়। তারপর কোন রাসবাযা ই. এন. টি. ডাক্তারের কাছে যে যায়, তা অবশ্য তার জানা নেই।

বহু বছর সাহেবদের দেশে থাকা সত্ত্বেও এখন সাহেবদেব সব কিছুকেই আহুক ত্যাগ করেছেন। ভাষাটাও ভুলতে পারলে সুখী হতেন। কিন্তু সাঁতার বা সাইকেল বা সঙ্গম শেখার মতনই ভাষাও একবার শিখে ফেললে সেই লিপ্ততা ইলিশ মাছের গায়ের গন্ধরই মতন লেগে থাকে স্মৃতির আঙুলে। ছাড়তে চায় না সহজে।

মাছটা ভারি সেয়ানা। আর মস্ত বড়ও। এত বড় মাছ, ভীরাপ্পান বলছিল, এ তল্লাটে কেউ নাকি দেখেইনি। একবার ভীরাপ্পানের নিজের ক্যাটাম্যারনের কাছাকাছি তাকে বাগে পেয়ে, এখানের জারোয়া বা ওঙ্গে উপজাতিরা যেমন করে হারপুন দিয়ে মাছ মারে, তেমনই করে ভীরাপ্পান তার হারপুন ছুড়েছিল। দড়ি বাঁধা ছিল হারপুন-এর সঙ্গে। মাছটা ভীরাপ্পানকে ক্যাটাম্যারন থেকে উপড়ে নিয়ে টেনে সমুদ্রের জলের গভীরে চলে গেছিল নীল তিমি "মবি ডিক"-এর মতন। দড়ি, পায়ে জড়িয়ে গিয়ে, জলের নিচে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেত ভীরাপ্পান যদি না ভীরাপ্পানের মান্য সমুদ্রের দেবতা অশান্ডিমারু তাকে সময় মতন বাঁচাতেন। কোনওক্রমে সাঁতরে জলের উপরে উঠে এসে তার ক্যাটাম্যারনের কাছে ডুবতে ডুবতে, জল খেতে খেতে, সাঁতরে পৌঁছেছিল ও। ভাগ্যিস সমুদ্রের এই দিকটাতে হাঙর খুব বেশি আসে না। তাছাড়া, ভীরাপ্পান জলের পোকা। তামিলনাদে তার দেশ বটে কিন্তু সে বড়ই হয়েছে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার সমুদ্রপারের তেলুগু জেলেদের এক ছোট্ট গ্রামে। ওর গায়ে সমুদ্রের গন্ধ। এখন যেমন আহুক-এর গায়েও হয়ে গেছে। ওব চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল। সারা শরীরেই ঐ রকমের জেল্লা—ফসফরাস-এর জেল্লার মতো। আহুক-এর শরীবও ধীরে ধীরে সেরকম হয়ে উঠছে। তার মধ্যে বিপদ দেখেন তিনি। শরীরকে খাইয়ে দাইয়ে, মশারি-টশারি গুঁজে দিয়ে, পাশবালিশ এগিয়ে দিয়ে, ঘুম পাড়িয়েই এসেছিলেন উনি। 'হর্ণেট্স নেস্ট'-এর এই সামুদ্রিক প্রকৃতি এই অবেলাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে শরীরের। মাঝরাতে খিদে পাচ্ছে তাঁর। কী যে দেন খেতে! শরীর তো ব্রাজিলের পিরানহা মাছ নয় যে, নিজের প্রজাতিকে নিজে খেয়ে সুখী হবে। বড়ই বিপদে পড়েছেন। শরীরের কাঁকড়াগুলো সমুদ্রতটের লাল কাঁকড়াদের মতো যৌবনের ঢেউ সরে যেতেই বালির মধ্যের অগণ্য গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। এখন যৌবনের ঢেউ সরে যাবার পরে তারা এই সামুদ্রিক এবং প্রাকৃতিক অভিঘাতে আবারও বেরিয়ে পড়েছে। ইতিউতি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যৌবন চলে গেছে ভরা কোটালের মতো দুইপার ভাসিয়ে নিয়ে কিন্তু তার যন্ত্রণাকে প্রাণ দিয়েছে এই প্রকৃতি। বড়ই বিপদ তাঁর।

এখন গাছপালা, এই দ্বীপ এবং সমুদ্রই তাঁর জীবন। তাঁর মরণও হবে একদিন।

ভীরাপ্পানও স্থির বিশ্বাসে, ভারি গলাতে বলে সেকথা প্রায়ই। যদিও সে যুবকই।

ফাত্নাটা ঢেউয়ে দোলে। বিকেলের সমুদ্র কত কথা যে বলে, না-বলে, ফাত্নাটার সঙ্গে, আহুকের সঙ্গে! যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের উপরে এমনি করে কাজে বা

অকাজে বসে না থেকেছেন তাঁদের পক্ষে এই নিকুঞ্জ সামুদ্রিক নীল সবুজ কথার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।

টুনা মাছটাও কথা বলে আহুকের সঙ্গে। দূরে ভেসে উঠে ঝলকে-ঝলকে পলকে পলকে দেখে আহুককে। তবে রোজ নয়, কোনও কোনও দিন। দুজনের মধ্যে সুখ-দুখের কথা হয়। এসব কথার খোঁজ সব মানুষে রাখে না। যা পাখি জানে, সমুদ্র জানে, মাছ জানে, তার সবই কি মানুষে জানতে পারে?

সব মানুষেই?

মাঝে মাঝে ছোট মাছ এসে ঠোকর দেয় ফাত্‌নাতে। বুড়বুড়ি ওঠে না পুকুরের মতন সমুদ্রের সতত বহমান জলে। ফাত্‌নার দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে রঙ না-পাল্টানো জলের নিচের নানা-রঙা প্রবালের প্রাসাদ পাহারা-দেওয়া গভীর গম্ভীর সুপুরুষ সমুদ্রের দিকে চেয়ে, সি-গালেদের আর টার্নদের বিষণ্ণ স্বগতোক্তি আর ক্বচিৎ হোয়াইট-বেলিড (WHITE-BELLIED) সি-ঈগলদের তীক্ষ্ণ ডাকে চমকে উঠে ধ্যান ভেঙে যায় আহুক-এর। পরক্ষণেই আবার নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে যান।

মাছ যাঁরা কখনও ধরেছেন তাঁরাই শুধুমাত্র জানেন যে, সেই নেশার সব মজাই এই সীমাহীন ধৈর্যরই মধ্যে। প্রকৃতি, তা সে গ্রাম-প্রকৃতিই হোক, নদী-খাল বিলের প্রকৃতিই হোক, কী সামুদ্রিক রহস্যময় প্রকৃতি, সব প্রকৃতিই ভাল বাওয়ার্চির রাঁধা বিরিয়ানির "হান্ডি নিকালনা"রই মতন ধীরে ধীরে, পরতে পরতে নিজেকে উন্মোচিত করে, ফড়িং-এর ওড়ার মধ্যে, কাঁচপোকার বুঁবু-বুঁইই ধ্বনির মধ্যে, ঘুঘুর আর বুলবুলির ডাকের মধ্যে, শীতের মধ্যাহ্নর মন্থর হাওয়ায় দূরের নদীর গেরুয়া চরে বসে-থাকা, স্বগতোক্তি-করা সোনালি চখা-চখির শিহরতোলা শিষ-এর মধ্যে দিয়ে অথবা দিগন্তলীন আকাশের নিচের দিগন্তনীল সমুদ্রর গভীর সম্মোহনী জলজ শান্তির অমোঘতার মধ্যে দিয়ে। এ জগতে থেকেও অন্য জগতে চলে যেতে হয় তখন। যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন। এই জলজ মৎস্যগন্ধী অভিজ্ঞতার কথা অনভিজ্ঞ অন্যাকে কখনওই বলে বোঝানো যায় না।

ভীরাপ্পান বলে, সমুদ্রের গভীরে নাকি অনেকই দেবতার বাস। আহুক শোনেন। এমনিতে ভীরাপ্পান মিতবাক। ক্বচিৎ নিজের মনে বলে চলে সেইসব দেব-দেবীর কথা। মুত্তেলাম্মার, টৌটম্মার কথা। তবে সমুদ্রের দেবতা নাকি অশাভিমারু, যিনি ঐ খুনে টুনা মাছটার হাতের নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন ওকে। সমুদ্র শীতকালে যখন শান্ত থাকে তখন ক্যাটাম্যারন নিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে গেলে নাকি দেখা যায় স্বচ্ছ জলের নিচে একটা লাল পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে অশাভিমারুর থা... গায়ে যুগ-যুগান্তের শ্যাওলার পরত জমে জমে কালো হয়ে গেছে সে পাহাড়। কত রকমের ফাঙ্গি, অ্যালগি, প্ল্যাংকটন। তাকে ছোঁয়, ছুঁয়েই আবার ভেসে যায়। আর যেখানে যেখানে প্রবাল আছে সেখানে জলের নানা রঙ। সবজে, কালচে, লালচে, কমলাভ। মনে হয়, স্বপ্নেরই দেশ বুঝি। সেখানে জলের তলার সেই পাহাড়ের গায়ে

রাজপ্রাসাদ। তাতে রাজকন্যা থাকে। সেই শ্যাওলা ধরা নীলচে পাহাড়ের চারপাশে লক্ষ লক্ষ স্যামন আর সার্ডিন আর সুরমেই মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়। টুনারাও। তাদের পাখনা নেড়ে নেড়ে নীল জলকে আরও নীল করে দেয় তারা। নীল জলের উপর দিয়ে শীতের হলুদ রোদ এসে তেরছা হয়ে পড়ে ওদের গায়ে। বহুবর্ণ দেখায় তখন মাছের ঝাঁকেদের। সূর্যর অনাবিল আলোর দাক্ষিণ্যে প্রবালের রঙ ঠিকরে যায় ওদের রুপোলি গায়ে।

কখনও-সখনও টাইগার-শার্ক নিঃশব্দে প্রচণ্ড বেগে এসে স্যামন-সার্ডিন আর সুরমেইদের ঝাঁককে তাড়া করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিছোনো রুপোর চাদরের মতন মাছের ঝাঁকেরা টুকরো টুকরো হয়ে দলছুট হয়ে গিয়ে চারদিকে বিভিন্নমুখী দলে ছড়িয়ে যায় জলের নিচে আলোর ঝলকানি তুলে। জলের নিচে উল্টোপাল্টা গন্তব্যে ছোট মাছ দৌড়োয়, বড় মাছ দৌড়োয়, আলো দৌড়োয় আর পেছনে পেছনে ছায়াও দৌড়োয় নিজের নিজের স্পন্দিত সত্তাকে তাড়া করে। আর তাদের গায়ের বিচ্ছুরিত আলো-ছায়া, জলজ, সবুজ অন্ধকারে, খসে-যাওয়া তারার ঔজ্জ্বল্যেরই মতন প্রতিসরিত হয় চতুর্দিকে।

বেশ লাগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের উপরে দুলতে দুলতে বসে ভাবতে। হাওয়াতে যেন মাছের গন্ধ ভাসে। জলেও ভাসে। বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলের হাওয়াতে গা চিটচিট করে না তেমন। কেন করে না আহুক জানেন না। এ তো আর দীঘা, পুরী, গোপালপুর, গোয়া বা কোভালাম নয়, এই দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে হাজার মাইল সমুদ্র। ভাবলেই দারুণ লাগে। দ্বীপ তো একেই বলে। এসব কি আর বালিগঞ্জের লেক-এর মধ্যের পানকৌড়িদের প্রাতঃকৃত্য সারার দ্বীপ! উপমহাদেশের গায়ে গা-ঠেকানো সমুদ্র আর চারদিকের হাজার হাজার মাইল সুনীল জলরাশির মধ্যে তফাত আছে অনেক। চারদিকে সীমাহীন জলরাশির বিস্তার এই অঞ্চলের দ্বীপবাসীদের মনে এক ধরনের অসহায়তার জন্ম দেয়। প্রকৃতিই যে এখনও অমোঘ, মানুষ যে এখনও প্রকৃতির খেয়ালখুশির দাস, সে কথা অন্তরে অনুভব করে। ব্যারেন আইল্যান্ড আগ্নেয়গিরির দ্বীপ। কয়েক বছর আগেই সে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল। কখন যে মেঘের গুরুগুরুর মতো ভূগর্ভেও গুরুগুরু রবে মাদল বেজে উঠবে তারপরে উৎক্ষিপ্ত হবে তরল আকর, আগুন আর ধুঁয়োর সঙ্গে, তা কেই বা বলতে পারে!

নানারকম অনিশ্চয়তা আছে এখানে। অমোঘ, পূর্ব-নির্ধারিত। মানুষের-নিয়ন্ত্রিত জীবন তাই ঘৃণাভরে পায়ে ঠেলে আহুক বোস জীবনের শেষ বেলাতে এই "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এ এসে বাসা বেঁধেছেন।

জমি, বাড়ি, নারী বড় পিছু টানে। সেই আবর্ত থেকে নিজেকে যে বিযুক্ত করতে পেরেছেন একথা মনে করেই নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ান মনে মনে।

সামুদ্রিক মাছ এখানে অনেকই রকম। সবরকমের নাম কি আর আহুক জানেন? হাঙরও আছে নানারকম। যেসব মাছ খায় এখানের মানুষে তার মধ্যে সুরমেই,

কোরাই, ম্যাকারেল, সিলভার বেলিজ, মানে রুপোলি পেট এর মাছ, অ্যাকোরিজ, সার্ডিনস, সিয়ার ইত্যাদি আছে। সার্ডিনের মধ্যে দু'রকম দেখেছেন। জানেন না, হয়ত আরও নানারকম আছে। হারেমগুলা, আব ড্রসুমেরিয়া অ্যাকুয়া। এছাড়াও আছে রেজ, বারাকুডা, মুলেট। জেলি ফিশ। নানারকম অক্টোপাস। শামুক, মুসেল্‌স। কাঁকড়া, চিংড়ি। আর কত নাম মনে করবেন।

মিষ্টি জল আছে অনেক দ্বীপেরই ভিতরে ভিতরে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা আসার পর তাঁরা অনেক জায়গাতে পুকুরও কেটেছেন। মিষ্টি জলের মাছ খোঁজ করে যোগাড় করতে হয়, কালেভদ্রে অতিথি এলে। তখন ভীরাপ্পানকে জেলেদের দ্বীপে পাঠান। রুই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়। তবে এই নির্জন দ্বীপে সামুদ্রিক মাছই তাঁদেব প্রধান খাদ্য। ভীরাপ্পান শুঁটকিও খায়। যেদিন সে শুঁটকি রাঁধে সেদিন সামুদ্রিক হাওয়াতেও শুঁটকির গন্ধ ভাসে। একদিন খেয়ে দেখেছিলেন। বেজায় ঝাল। একেবারে লাল। কিন্তু আশ্চর্য! খাবার সময়ে কিন্তু তেমন গন্ধ পাননি। সব খাদ্য-পানীয়তেই রুচি তৈরি করতে হয়। তাঁর মনে আছে, শিশুকালে তাঁর এক উকিল মেসোর বাড়িতে এক মাড়োয়ারি মক্কেলের পাঠানো দই-বড়া খেয়ে বমি করে ফেলেছিলেন। কোনও কিছুতেই নাক সিঁটকোন না সারা পৃথিবী-ঘোরা আহুক। কোনও কিছুতেই তীব্র আসক্তি যেমন নেই, অনীহাও নেই। যাকে ইংরেজিতে বলে To ride with the tide, তাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অবশ্য এত সব জেনেবুঝেও লাভ তো বিশেষ হয়নি। হলে কি ষাট পেরিয়ে এসে একা এই দ্বীপেব বাসিন্দা হন?

তবে লাভ-ক্ষতির বিচার তো সকলের কাছে সমান নয়। পৃথিবীতে বড় বেশি মানুষ হয়ে গেছে, বড় বেশি কথা, আওয়াজ, গাড়ি-ঘোড়া, ট্রেন-প্লেন সেখানে, বড় লোভ, বড় বেশি কম্যুনিকেশান। ফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট। মানুষের বেশি টাকা রোজগার করার সুবিধে ছাড়া আর কোনও মহৎ উপকার এতে হবে কি না জানেন না আহুক। তাছাড়া, এই উদবৃত্ত সময় নিয়ে মানুষ কী করছে তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

আহুক মানুষটি বিজ্ঞান-বিরোধী। আজকাল এমন মানুষকেই অন্যে পাগল বলে। ছাগলও বলে, কারণ তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসীও।

আহুক কি বুড়ো হচ্ছেন? ষাট বছরে আজকাল কেউই বুড়ো হয় না। কিন্তু বুড়ো না হলে এমন এমন ভয়-ভক্তি জাগছে কেন মনে?

দূরে মাছটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেল। পাজি আছে। একদিন ইসপার-উসপার হবে। এই টুনা মাছেরাও ম্যাকারেল পরিবারেরই। কিন্তু শিরদাঁড়াটা অন্যরকম। শিরদাঁড়াই তো আসল। মাছ কিংবা মানুষের। শিরদাঁড়াই তো, মেরুদণ্ডই তো মানুষে মানুষে, মাছে মাছে পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়।

এই মাছটা প্রায় চার মিটার মতন লম্বা। যদিও এদের প্রজাতি পাঁচ মিটার অবধি

লম্বা হয়। এদের নাম ব্লু-ফিন টুনা। ওজনও হবে সাত কুইন্টালের উপরে। সে যে পরিমাণ জল সরায় চলার সময়ে দু'পাশে, ঘাই মারলে যে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়, তা দেখেই ভীরাপ্পানের এবং আহুকের অনুমান এসব। অনেক অন্ধকার রাতে তারা ভরা আকাশের নিচে আহুকের বাংলোর উঁচু বারান্দাতে ইজিচেয়ারে বসে আহুক ভীরাপ্পানের সঙ্গে মাছটাকে নিয়ে আলোচনা করেন।

কে জানে! মাছটাও হয়ত ওদের নিয়ে অন্য কোনও মাছের সঙ্গে আলোচনা করে। জীবনে যে মাছটিকে ধরা যায়নি, যে ইপ্সীত পুরুষ বা নারীকে পাওয়া হয়নি, তার কথাই মনে হয় শয়নে-স্বপনে-জাগরণে। এই এক আশ্চর্য স্বভাব মানুষের। পুরুষের। এবং নারীরও।

ঐ টুনা মাছটার পিঠটা নীলচে-কালো, আর পেটটা সাদা। সামনের ডানাগুলো ধোঁয়াটে কালো আর পেছনেরগুলো হালকা রঙের। আর পিঠের উপরের ডানা এবং জননেন্দ্রিযর কাছের গোঁফগুলোর রঙ হালকা-হলুদ। ধারগুলো কালো।

ছ'বছর হতে চলল আহুক-এর এই দ্বীপে নির্জন বাসের। কিন্তু খারাপ লাগে না একটুও। সূর্যের আলো, হাওয়া, জল, ঝড়, সমুদ্র, সমুদ্রতট, দ্বীপের মধ্যের আদিম জঙ্গল এই সবে যেন নেশা ধরে গেছে পুরোপুরি। সারা পৃথিবী ঘুরে অয়ন সম্পূর্ণ করে শেষভাগে যেন বড় মনোমত ঠাঁই-এ এসে থিতু হয়েছেন। আজকাল মাসে একবার পোর্ট ব্লেয়ারে গেলেও যেন হাঁফ ধরে যায়। বড় অকারণের কথা বলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষেই। তাছাড়া, আদেখলা ট্যুওরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে। খালি-গায়ের, শর্টস-পরা, ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল আর কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা তাঁর দিকে তাঁরা এমন করে চেয়ে থাকেন যেন কোনো জেলের কয়েদ ভেঙে সদ্য-বেরুনো কোনও খুনী আসামীই তিনি। আয়নাও নেই একটিও এই দ্বীপে। আয়নাকে যে-পুরুষ চিরতবে তাঁর জীবন থেকে বিসর্জন দিতে পেরেছেন তিনিই সার্থক পুরুষ। আয়নার প্রযোজন মেয়েদের। বিধাতা যাঁদের পাখির মতন, প্রজাপতির মতন, রুপোলি মাছের মতনই সুন্দর করে গড়েছেন, গড়েছেন ফুলের মতন করে।

মাছটা আরেকবার হঠাৎই অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল আহুক-এর পেছন দিয়ে এসে অনেকটা সামনে দিয়ে আড়াআড়ি পার হল, তাঁর ভাসমান শান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে মৃদু দোদুল্যমান বোটটাকে। জলের নিচে সেই মাছটির দীর্ঘ ও সুন্দর কালো ছায়া দেখে বুঝলেন আহুক। জলের উপরিতল থেকে মাত্র হাতখানেক নিচ দিয়ে যাচ্ছে সে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার নীলচে-কালো দীর্ঘ শরীর। নীল জলের নিচে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভাবছিলেন আহুক, যার ছায়াই এত সুন্দর তার কায়া না জানি কী সুন্দর!

কি হে? ভাবছটা কি? তুমি ভেবেছটা কি?

আহুক বললেন তাকে, মনে মনে।

তুমি কি ভাবছ?

মাছটাও যেন তার কান্‌কা নাড়িয়ে আহুককে বলল।

কী ভাবব, তাই ভাবছি।

আমাকে ধরে তোমার কি লাভ? দুজনে মিলে আমাকে খেতে পারবে? ক'বছর লাগবে? শুঁটকি করে রাখবে বুঝি?

তোমার মতন সুন্দরকে কেউ অমন অপমান করতে পারে।

তবে?

তোমাকে খাবই না। এক টুকরোও না।

তবে?

তবে কি?

তোমাকে ধরার জন্যেই ধরব। যেহেতু তুমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাও। তাছাড়া কথাটা কি জানো?

আহুক বলল।

কী ?

কথাটা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার নিস্তরঙ্গ শেষ জীবনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। প্রতিযোগিতা ছাড়া কোনও পুরুষই কি বাঁচে? বাঁচার মতন বাঁচে? সারা জীবন মানুষের সমাজে অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে রমরম করে বেঁচে এসেছি। যখন সারা জীবনের প্রাপ্তি বসে বসে সুদখোর কৃপণ বুড়োর মতন ভোগ করার সময় এল, তখনই তো পালিয়ে এলাম সব ছেড়েছুড়ে।

কেন? তুমি কি পাগল?

মাছটি বলল।

অনেকেই তো তাই বলে। টিটিঙ্গিও বলত।

টিটিঙ্গি কে?

আমার বউ।

সে কোথায়? আনোনি তাকে? থাকো তো একটা ঝাঁকড়া-মাথা দুর্গন্ধ নারকোল তেল মাখা দৈত্যের মতন দেখতে পুরুষের সঙ্গে। বউ থাকতে কেউ ...

বউ মরে গেছে আমার।

তুমি তো ভাগ্যবান। সবাই ত বলে, যে পুরুষের বা মাছের বৌ মরে সে ভাগ্যবান।

সকলের কি সকলকে ভাল লাগে? তাছাড়া, কোনও পুরুষ অথবা নারী বা মাছই কি অন্য একজন নারী ও পুরুষকে একশোভাগ সুখী করতে পারে?

কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রী তাহলে ঘর করছে কী করে? আনন্দে?

ঘর করছে কেউ পঞ্চাশ ভাগ সুখে, কেউ ষাট ভাগ, সত্তর ভাগ, কেউবা নব্বই ভাগ সুখে। কেউবা দশ ভাগ সুখেও করছে। আর কেউ বা অসুখে। তাছাড়া, আনন্দে কেউই করছে না। করছে নিছক অভ্যেসে। অভ্যেসটাকেই আনন্দ মনে করে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

তারপর একটু চুপ করে আহুক বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানো?

কী?

সুখী মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ। আসলে, সুখ যে কাকে বলে, তাই তারা সাহস করে জানতে চায়নি। বেশি জানলেই বিপদ, বেশি জানলেই বড় দুঃখ। সুখী হতে হলে সাধারণ হতে হয়, পোকাদের মতন, কুকুর-বেড়ালের মতন, এই তোমার মতন মাছেদের মতন। মানুষদের বড়ই কষ্ট। মানুষ হয়ে জন্মালেই কষ্ট। বাঁচাবে কে আমাদের? তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার ছিল।

কি?

মানে, আমার দোষ ছিল।

কী দোষ।

আমাকে আরও অনেক মেয়ে ভালবাসত।

তাতে কী?

টিটিঙ্গি মনে করত সেই আমার একমাত্র মালিক।

তার দোষ কি? তুমিও কি মনে করতে না যে তুমিই তার একমাত্র মালিক?

না। করতাম না। বিশ্বাস করো, করতাম না।

তারপরেই আহুক বলল, তুমি ছেলে না মেয়ে টুনা?

জলে খিলখিল আওয়াজ তুলে হাসল মাছটা। বলল, আমি মেয়ে। সুন্দর নই, সুন্দরী।

তোমাকে টুনি বলে ডাকব তাহলে আমি।

ডেকো। নামে কি আসে যায়! তোমাকে টেনে নিয়ে যেদিন সমুদ্রের তলায় চলে যাব নানারঙা প্রবালের মধ্যে, রঙ-বেরঙের ফুলের মধ্যে, সেদিন তোমাকেও জড়িয়ে ধরব মানুষের মেয়েদের মতন। চুমুও খেয়ে দিতে পারি একটা। রাগ করবে না কি?

না। চুমু খেলে কেউ কি রাগ করে? আশ্চর্য মাছ তো তুমি! খুড়ি, মানুষ। তারপর?

তারপর কি? তুমি তো জলের তলায় দম-বন্ধ হয়ে মরেই যাবে।

তারপর?

তারপর তোমাকে হাঙ্গরে খাবে, নয়তো ছোট মাছে খাবে ঠুকরে ঠুকরে। সে বড় বীভৎস মৃত্যু।

তুমি আমাকে খাবে না?

না। আমি তো মানুষের মেয়ে নই যে পুরুষ মানুষকে খাব। ভাবছি তোমাকে চুমুও খাব না।

খাবে না?

না। তোমাকে মৃত্যুই চুমু খাবে।

তারপরই বলল, পুরুষ মানুষ, তুমি আমার শান্তি নষ্ট করছ কেন গত তিন মাস ধরে?

তুমি বুঝবে না।

কেন বুঝব না?

তুমি বুঝবে না। একজন পুরুষ মানুষ সবচেয়ে বেশি করে বাঁচে বিপদের মধ্যে। পুরুষের মতন পুরুষ।

তারপর বলল, কে জানে! আসলে, আমার অশান্তিকে দূর করার জন্যেই তোমার শান্তি নষ্ট করছি হয়ত।

তুমি বলছ, পুরুষ মানুষ বাঁচার মতো বাঁচে শুধু বিপদেরই মধ্যে। কিন্তু কোনও পুরুষের যদি সত্যি কোনও বিপদ না থাকে?

তখন বিপদ তৈরি করে নিতে হয়। বিপদ ঠিক নয়, বলব, চ্যালেঞ্জ। কারো বিরুদ্ধে দ্বৈরথ।

বুঝেছি। তুমি যেমন আমার বিপদ হয়ে এসেছ অথবা আমি তোমার বিপদ হয়ে। থুড়ি, চ্যালেঞ্জ।

তবে, তুমি মেয়ে না হলেই আমি খুশি হতাম।

কেন?

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের তো লড়াই-এর সম্পর্ক নয়।

তো? কিসের সম্পর্ক?

আদরের, ভালবাসার।

তোমার বউ টিটিঙ্গি না ফিটিঙ্গি তোমাকে ছেড়ে গেল কেন?

টিটিঙ্গি তো মরে গেল। বেচারী। ছেড়ে গেছিল আমার প্রেমিকা, চিচিঙ্গা।

কেন?

সে ভালবাসার মানেই জানতো না। ও ছিল দু'নম্বরি। জালি! আশ্চর্য! ভালবাসার মানে কিন্তু খুব কম মেয়েরাই জানে। মাছেদের মেয়েরাও কি জানে?

টুনি হাসল যেন। জলের নিচে কুলকুচি করার মতন শব্দ হল।

কি? উত্তর দিচ্ছ না আবার হাসছ?

আহুক বলল।

টুনি বলল, পুরুষ মাছেদেরই জিজ্ঞেস কোরো। আমি কি করে বলব?

তুমি আমাকে ডুবিয়ে মেরে খুশি হবে?

কারোকে মেরে কেউই কি খুশি হয় কখনও?

তবে মারবে কেন?

তুমি আমাকে মারতে চাও যে। আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে তো মরতে হবেই।

কেন? মরতে হবেই কেন?

মৃত্যুকে মহান করার জন্যে।

আহুক চুপ করে রইল। উত্তর দিল না। বা, দিতে পারল না গভীর জলের মাছের এই গভীর কথার।

বেলা পড়ে আসছে। জলের রঙ সবুজ থেকে নীল, নীল থেকে কালো হয়ে উঠছে। যদিও এখন শুক্লপক্ষ কিন্তু তবুও রাত নেমে গেলে হর্ণেট্স নেস্ট-এর নড়বড়ে জেটিতে উঠতে অসুবিধা হয়। আহুক-এর বয়স হয়েছে বলে নয়, ভীরাপ্পানেরও হয়। জেটি তো নামেই। মেরামত হয়নি বহুদিন। তাছাড়া সবসময়েই ঢেউ থাকে তো। 'হর্ণেট্স নেস্ট'-এ নানান অসুবিধা নইলে জলদস্যুরাও কি এমন নাম দেয় দ্বীপের?

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আহুক বললেন, তুমি একদিনও কামড় দাও না কেন আমার টোপ-এ?

তুমি যে টোপ দাও তা তো আমি খাই না। আমি মাছই খাই না! ঐ টোপ দেবার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে? ঐ ঝাঁকড়া-চুলো? আমি তিমি-হাঙ্গরের মতো প্ল্যাংকটন খেয়ে বাঁচি। তুমি মানুষের মধ্যে যেমন অন্যরকম, আমিও মাছেদের মধ্যে অন্যরকম।

মাছ ছাড়াও তো অনেক কিছু দিয়ে দেখেছি। বঁড়শিতে গেঁথে। তাও তো তুমি খাওনি। তুমি কি নিখাকী মাছ?

আমি কী খাই আর কী খাই না তাই যদি না জানো তবে কি করে আশা করো যে তোমার বঁড়শিতে আমি চুমু খাব? হাঃ।

একটা হাওয়া উঠল। পেছনের আকাশের অবস্থা যে কখন আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে এসেছিল তা লক্ষ্য করেননি আহুক। শক্তিশালী আউটবোর্ড এঞ্জিনটা স্টার্ট করলেন। কিন্তু স্টার্ট হল না। মাছ ধরতে যখন আসেন তখন বড় বোট নিয়ে আসেন না। তাঁর তরুণী সুন্দরী মালকিনের প্রতি তিনি যথেষ্টই বিবেচক।

রোদ মরে যেতেই হাওয়াটা হঠাৎই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবং খুব জোরে বইতে লাগল এলোমেলো। কালো, অথৈ জলে বড় বড় ঢেউ উঠতে লাগল। নৌকোর হালটা ঘুরিয়ে দিলেন আহুক। নইলে পাশ থেকে ঢেউ লেগে থেমে থাকা বোটটা হঠাৎ উল্টেও যেতে পারে। প্রায়ই ভাবেন, একটা ক্যাটাম্যারন বানাবেন সাইড-কার লাগানো মোটরবাইকের মতো, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ক্যাটাম্যারনে উল্টে যাওয়ার ভয় থাকে না। তাছাড়া, এতো আর নদী বা খাল-বিল নয় যে বিপদ দেখে নোঙর করবেন। এখানে থামা নেই। শুধুই চলা। হয় চলো, নয় পঙ্গু, অসহায় স্থবিরের মতন জলে ডুবে মরো। কোনও মধ্যপন্থা নেই।

আবারও স্টার্ট করার জন্যে স্টার্টারের দড়ি ধরে টানলেন আহুক। কিন্তু এঞ্জিন তবু নীরব।

মাছটাকে যেন হঠাৎই খুব কাছেই একবার দেখতে পেলেন উনি। মেয়ে মাছ। টুনা নয়, টুনি।

সে বলল, চললাম, আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তুমিই আমার প্রাণ আবার তুমিই আমার যম। তাই তো এতো ভালবাসি।

কাকে?

তোমাকে।

তারপরই টুনি বলল, স্টার্ট করো এবারে। স্টার্ট হবে।

তুমি কী করে জানলে?

আমি জানি যে! তুমি কি জানো, এইসব দ্বীপপুঞ্জের মানুষেরা, এই সব সমুদ্রের মাছেরা কত দেবতার দয়াতে বাঁচে?

না তো। সমুদ্রের দেবতার নাম কী ওদের?

জুরুইন। জুরুইন বড় সর্বনাশা দেবতা। যার বাস জলে। আর ওদের ঝড়ের দেবতা পুলুগা, উলুগারই আরেক নাম বলতো পারো। তোমাকে আরেকবার কাছ থেকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই জুরুইনকে বলে তোমার এঞ্জিনকে মেরে রেখেছিলাম আমি। তোমাকে দেখা হল, এবার যাও। আহা, যাওয়া নেই এসো। আবার এসো।

দেখলে কেমন?

কি?

কি নয়, বল কাকে?

কাকে?

আমাকে।

ভালই। পুরুষ পুরুষ। পুরুষ মেয়েলি হলে ভাল লাগে না।

টুনি অন্ধকার জলে একটি দীর্ঘ অন্ধকারতর অপস্রিয়মান, হিল্লোলিত ছায়া হয়ে মিলিয়ে যেতেই আহুক-এর বোটের এঞ্জিন কথা বলে উঠল।

হালটা ঘুরিয়ে 'দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট'-এর দিকে চললেন আহুক।

কম্পাস একটা থাকে সবসময়েই বুকে ঝোলানো। যখনই সমুদ্রে নামেন। তবে প্রয়োজন হয় না। উনি জানেন যে, যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন ওটা কাজে লাগবে না। এমনই হয়। উনি অনেক ঘাটের জল-খাওয়া মানুষ বলেই জানেন।

আজ সামনে রাত এবং দুর্যোগ। সামান্য আলোর আভাস এখনও আছে যদিও। বাঁ হাতে হালটা ধরে ডান হাতে কম্পাসটা দেখে নিলেন আহুক একবার।

আধো-অন্ধকারে খড়ের সাদা টুপি মাথায় দেওয়া, দৃঢ়, সুন্দর গড়নের বাদামি পুরুষ মানুষটি সাদা বোটটি চালিয়ে গুট গুট গুট গুট শব্দ করে পেছনের জলে ঢেউ তুলতে তুলতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মানুষটার ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও বসন নেই। কখনওই থাকে না। তবে চুল আছে। কাঁচা-পাকা। বুক ভরা। আর মাথার পেছন দিকে। এবং SALT AND PEPPER দাড়ি-গোঁফ। নাপিতও নেই, আয়নাও নেই, এখানে।

মেয়ে মাছটা জলের উপরে একবার নাক তুলে সেই বয়স্ক কিন্তু সুন্দর পুরুষের ঘামে-ভেজা-বগলতলির গন্ধ নিল দু'নাক ভরে। তারপর নিঃশব্দে হেসে, গভীর জলে চলে গেল তার সাদা পেট আর নীলচে-কালো পিছল পিঠে অতল জলের স্পর্শ এবং বিপরীত স্রোত অনুভব করতে করতে।

আহুক মনে মনে বললেন মাছটা ভারি ভাল।

মাছটা এখন অনেকই নিচে চলে গেছে, যেখানে রোদ কখনওই পৌঁছয় না। জল

এখানে ভারি ঠাণ্ডা। আব এখন তো শীতকাল। যদিও শীত যাকে বলে, তা এখানে কখনওই আসে না। ছাই আর বিস্কিট-রঙা প্রবাল সেই গভীরে। নানা-রঙা লতা গুল্ম, গাছ-পালা, জলজ শ্যাওলা, ছত্রাক আর নানাবকম ভাসমান প্রাণ। ঠাণ্ডা জলে মানুষেব মেয়েরা সন্ধেবেলা যেমন গা ধোয় তেমন করে সাঁতাব কেটে কেটে তলপেট, বুকে, মুখে সমুদ্রের ফেনা ঘষে ঘষে মেয়েমাছটি, যার নাম দিয়েছেন আহুক বোস টুনি, চান করতে লাগল। চান করতে করতে, সুন্দর হতে হতে মানুষের মেয়েরাও যেমন বলে, তেমন করে মনে মনে বলল, পুরুষ মানুষটা খুব ভাল। ওর সে চিচিঙ্গাটা নিশ্চয়ই বোকা অথবা পাজি ছিল। কেন যে ছেড়ে গেল! তার পুরুষ মাছটা যেমন ছিল, তেমনই।

টুনা মাছটা ভাবছিল, মানুষে আর মাছে কত মিল! বুদ্ধিতে যেমন, বোকামিতেও যেমন, পেজোমিতেও তেমন।

২

"অপরূপ সুন্দরী" বলতে বাংলাতে চলিতার্থে যা বোঝায় রংকিনী তা নয়। তবে তার গায়ের রঙটি ফলসা আর বেগুনীর মাঝামাঝি। তার গলার স্বরটি মৌটুসী পাখির মতনই মিষ্টি। ভারতের মতন এই ট্রপিকাল উপমহাদেশে যেহেতু অধিকাংশ মানুষের গায়ের রঙই কালো, কুৎসিত মানুষও ফর্সা হলেই এখানে সুন্দর বলে গণ্য হয়। আবার যেহেতু অধিকাংশ মানুষই রোগা, সুতরাং মোটা মানুষকেও সুন্দর বলে মনে হয়। এটা অবশ্য পুরুষদের বেলাতেই বেশি ঘটে।

আশ্চর্য সব ধ্যান-ধারণা আমাদের!

রংকিনী ভাবে।

না, ও জানে যে, ও চলিতার্থে সুন্দরী নয় তবে সে অবশ্যই ব্যক্তিত্বময়ী, মেধাবী, দৃঢ়চেতা। সৌন্দর্যর উপাদান চোখ নাক চিবুক যতটা নয়, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব তার চেয়ে অনেকই বেশি। নারীর এইসব গুণের মধ্যে যে সব ব্যতিক্রমী পুরুষ সৌন্দর্য দেখতে পান রংকিনী তাঁদের চোখে অবশ্যই সুন্দরী।

শিশুকাল থেকেই সে স্বাধীনচেতা। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে তার আর্থিক স্বাধীনতা এবং অঢেল স্বোপার্জিত অর্থ তার সেই পুরনো স্বাধীনতাবোধকে আরও দৃপ্ত করেছে। তার উদ্দেশ্যহীন, অসংযমী, বাস্তবজ্ঞানরহিত কিন্তু অবশ্যই সৃষ্টিশীল বাবা তাঁর নিজের সবরকম অপূর্ণতার, অসফলতার কারণে তাঁর জীবদ্দশাতে রংকিনীর শ্রদ্ধা পাননি কোনওদিনও কিন্তু এক ধরনের সহমর্মিতা পেয়েছিলেন। একে সহমর্মিতা বলবে, না করুণা, তা রংকিনী নিজেই ঠিক জানে না। হয়ত দয়াই। দয়া, কারণ পাওয়ার মতন কিছুমাত্রই পাননি সেই দুর্মুখ, ট্যাক্টলেস মানুষটি, বিবাহিতা স্ত্রীর ভালবাসা, সন্তানদের সম্মান, রাষ্ট্রের পুরস্কার। একজন স্বেচ্ছাচারী পুরুষের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই অর্থ অথবা অন্য অনেক কবি-সাহিত্যিক-গায়কের মতন জনপ্রিয়তাও। না, কিছুই মানুষটা পাননি। আশ্চর্য! এইসবের প্রতি মানুষটার আকর্ষণও ছিল না বিন্দুমাত্র। রংকিনী জানে যে, সত্যিই ছিল না।

ও মনে মনে বলত তার বাবাকে "অদ্ভুত লোক"।

তার বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর অসংলগ্ন ডায়ারি, তাঁর লেখা অসংখ্য না-পাঠানো চিঠি, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, শেষ না-করা ছবি, বহু গানের অর্ধসমাপ্ত স্বরলিপি এইসব দেখে রংকিনীর অপরাধবোধ জেগেছে মনে বারবার। মনে হয়েছে যে, তারা দু'ভাই-বোনে কেউই তাদের বাবার প্রতি ন্যায় করেনি। তাঁকে একটুও বোঝেওনি। তাঁর

মূল্যায়নই করেনি। যথার্থ মূল্যায়নের কথা তো ছেড়েই দিল। যেহেতু তাদের মা-ই তাদের কাছের মানুষ ছিলেন, যেহেতু তিনিই তাদের জন্যে "সব কিছু" করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতিই তাদের মমত্ব, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল অসীম। মাকে তারা দু'ভাই বোনে SINGLE PARENT বলেই গণ্য করে এসেছে বাবাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

কিন্তু রংকিনীর বাবা অসমঞ্জ রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিটি বই জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠাতে তাদের পরিবারে মাসে লক্ষাধিক টাকা রয়্যালটি আসে শুধুমাত্র একটিমাত্র প্রকাশক-এর কাছ থেকেই। অন্যদের কাছ থেকেও কম আসে না।

কে জানে! সম্ভবত এই অভাবনীয় অর্থই চলে যাওয়া অসমঞ্জ রায়কে POSTHUMOUSLY খুব দামি করে তুলেছে রংকিনীর কাছে। চলে যাওয়া বাবার রয়্যালটি আলোকবর্তিকা হয়ে তার বাবার নবমূল্যায়নে সাহায্য করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে সবকিছুরই মূল্যায়ন সম্ভবত টাকা দিয়েই হয়। তবে একথাও সত্যি যে, তার বাবার লেখা একটি বইও রংকিনী আগে পড়েনি। পড়া আরম্ভ করেছে সাম্প্রতিক অতীত থেকে। এবং যতই পড়ছে ততই বড় অপরাধী বোধ করছে নিজেকে। বুঝেছে যে, তার চলে-যাওয়া বাবার প্রতি তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অন্যায় করেছে। অথচ যে মানুষ চলে গেছে তার জন্যে করার তো আর কিছুই নেই!

জীবদ্দশাতে অসমঞ্জ রায়কে একটি অসভ্য অবাধ্য বেড়ালেরই মতন দেখেছে ওরা। বহুবারই, অলস, ভোলাভোলা-প্রকৃতির মানুষটিকে তাঁর পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, মায়েরই নির্দেশে। কিন্তু বাহ্যত অভিমানহীন তিনি, আবারও একদিন হঠাৎই ফিরে এসেছেন পুরো পরিবারের চরম বিরক্তি ঘটিয়ে। নির্লজ্জের মতন হেসে বলেছেন, তোদের ছেড়ে কি বেশিদিন কোথাওই থাকতে পারি আমি? বিশেষ করে রংকিকে ছেড়ে!

মা বলেছেন, ঢং দেখে বাঁচি না।

দাদা বলেছে, এলো ফিরে, ইটার্নাল বোর।

শুধু রংকিনীই কিছু বলেনি। মানুষটার পয়েন্ট অফ ভিউ বোঝার চেষ্টা করেছে। যদিও নীরবে। ওদের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে বাবার সপক্ষে সোচ্চারে কিছু বলার সাহস ওর ছিল না। বলবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। মা-ই অধ্যাপনা আর ছাত্রী পড়িয়ে, বলতে গেলে সংসার খরচের সিংহভাগ চালাতেন। বাবা, কবিতা বা গান লিখে কখনও-কখনও সামান্য কিছু পেতেন। পেতেন ক্বচিৎ-কদাচিৎ ছবি বিক্রি করেও। অথবা ক্বচিৎ গান গেয়েও। কিন্তু নিয়মিত রোজগার বলতে কিছুই ছিল না তাঁর। আজ রংকিনীর বাবা অসমঞ্জ রায় বেঁচে থাকলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা, অঢেল অর্থ নিয়ে অবশ্যই রীতিমত বিব্রত হতেন। এই দুইয়ের কোনওটিরই অসমঞ্জ রায়ের প্রত্যাশা যেমন ছিল না, প্রার্থনারও নয়।

আন্দামানগামী প্লেনের জানালার পাশে বসে, চলে-যাওয়া বাবার কথা, এতো সব পুরনো কথা কেন যে মনে পড়ছিল, জানে না রংকিনী। তার জীবনযাত্রা এমনই হয়েছে

যে কিছুমাত্র ভাবার সময়ই নেই। কাজের কথা ছাড়াও যে অন্য কোনও কিছুর কথা ভাবা যায় তা ও যেন ভুলেই গেছিল।

আজ সকালে ও বিছানা ছেড়েছিল শেষ রাতে। এখনও ঘুম লেগে আছে চোখে। দিল্লি কী ব্যাঙ্গালোরের বা মাড্রাসের ফ্লাইট ধরতেও তো অন্ধকার থাকতেই উঠতে হয়। কিন্তু সে তো কাজে যাওয়া। তখন একেবারেই Keyed-up হয়ে থাকে বিছানা ছাড়ার পর থেকেই। প্লেনে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেও "প্রেজেন্টেশানের" কাগজপত্র দেখে। ব্রিফিং-এর নোট্স। কিন্তু আন্দামানে তো আর কাজে যাচ্ছে না! বারো মাস, দিন-রাত, সারা দেশে এবং বিদেশেও ছুটোছুটি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে এই ওয়েল-ডিসার্ভড হলিডেতে বেরিয়ে পড়ে, প্লেনে ওঠার পরই সিট-বেল্ট বেঁধে নিয়েই তাই অজানিতেই ঘুমে এলিয়ে পড়েছিল রংকিনী। টেনশানে টানটান শরীর যেন হঠাৎই ছেড়ে দিয়েছে। এলিয়ে পড়েছে, ভেঙে-পড়া এলো-খোঁপারই মতন।

ব্রেকফাস্ট যখন সার্ভ করতে আরম্ভ করল স্টুয়ার্ডেসরা তখন পাশে-বসা চুমকি ওর হাতে এক ঠেলা মেরে বলল, কী রে রংকি, ব্রেকফাস্ট তো খাবি! তোকে দেখে মনে হচ্ছে গত রাতে বুঝি তোর ফুলশয্যাই ছিল।

ঘুম ভেঙে, চোখ খুলে অল্প হেসে বিড়বিড় করে রংকিনী বলল, আমার তো রোজই ফুলশয্যা। রাতেই বা ক'ঘণ্টা ঘুমোই!

তারপর হাই তুলে বলল, বাবাঃ। পুরো ছুটিটা শুধুই ঘুমোব আর রিল্যাক্স করব।

চুমকি ওর সমস্যা বোঝে। সেও একাধিক বড় বড় পারিবারিক ব্যবসা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে এবং সাফল্যের সঙ্গে চালায়। রংকিনীরই মতন, শুধু দেশের মধ্যেই নয়, সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে হয়। বললে, হয়ত অজ্ঞ মানুষেরা হাসবেন কিন্তু কথাটা সত্যি যে, কাজের জন্যে বিয়ে করার সময়টুকু তো বটেই কারোকে তেমন করে ভালবাসার সময়টুকুও করে উঠতে পারল না। এই সমস্যা চুমকির একার নয়। আজকের দিনের অগণ্য ভারতীয় মেধাবী, স্বাধীন, স্বনির্ভর এবং স্বচ্ছল মেয়েদের অনেকেরই।

সাঁতার কাটবি না? স্যুইম-স্যুট এনেছিস তো?

চুমকি জিজ্ঞেস করল রংকিনীকে।

তা এনেছি।

তবে আর কী। তবে আন্দামানে কিন্তু সাঁতার কাটার জায়গা নেই বিশেষ। এখানে সমুদ্রতট বলতে আমরা যা বুঝি, তেমন কমই আছে। তাছাড়া জল হঠাৎই গভীর হয়ে গেছে। কোভালম বা গোয়ার মতন নয়। পুরীর মতনও নয়।

তাই?

হ্যাঁ।

খাওয়াটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে তাহলেই হল।

ফিগার কনশাস, গ্রান্ড-হোটেলের 'পিংক এলিফ্যান্ট' আর তাজ-বেঙ্গলের 'ইনকগনিটো'তে উইক এন্ডে নাচতে যাওয়া সেক্সি চুমকি বলল।

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে রংকিনী আবারও ঘুম লাগাল। কত ঘুম যে জমে আছে না নেওয়া ছুটিরই মতন! হিসেব নেই তার। এবারে ওর সঙ্গে চুমকিও ঘুম লাগাল।

এখন মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। নিচের বঙ্গোপসাগর দেখাই যায় না। তাছাড়া অত উঁচু থেকে সমুদ্রকে তো বোঝাই যায় না সমুদ্র বলে। বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ায় যে ফেনা আর বুদ্বুদ ওঠে তা সরু সরু সাদা অস্পষ্ট সাপের মতন দেখায় নিচের কালচে জলভূমির উপরে। চারদিকে আদিগন্ত কালো জলভূমির মধ্যে অমন হাজার হাজার সাদা সাদা কিলবিলে সাপ চোখে পড়ে। অবশ্য আকাশ যখন নির্মেঘ থাকে তখনই। প্লেন যখন অনেকখানি নিচে নেমে আসে তখনই শুধু সমুদ্রকে সমুদ্র বলে চেনা যায়।

ওরা দুজনেই গাঢ় ঘুমে ছিল। এমন সময়ে প্লেনের মধ্যে হঠাৎই একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শুনে চোখ মেলতেই অডিও-সিস্টেমে সিট-বেল্ট বাঁধবার নির্দেশ এলো। প্লেনটা অনেকই নিচে নেমে এসেছে। সমুদ্র তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেই জলের উপরে, তাছাড়া বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে, বিভিন্ন গড়নের সবুজ রোমশ প্রাণীর মতন নানা ভূখণ্ডও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। চাপ-চাপ, ছোপ-ছোপ সবুজ। নিবিড় আদিম জঙ্গল, প্রাগৈতিহাসিক বনস্পতি। আরও নিচে নামলে বোঝা গেল যে ঘনসন্নিবিদ্ধ ঘাস-পাতাতে মাটি দেখাই যায় না মোটে। শুধু দু'এক জায়গাতেই সিঁদুরে-রঙা মাটি চোখে পড়ে, ওড়িশার পাহাড়ে পাহাড়ে, মন্থলসুখাতে, বন্ধ হয়ে যাওয়া OPEN CAST ম্যাঙ্গানীজ আকরের খনিগুলিব সিঁদুর রঙের মতন। নইলে, শুধুই সবুজ আর সবুজ। উপর থেকে দেখা সবুজ দ্বীপগুলির নরম স্নিগ্ধতা বড়ই নয়নলোভন।

এই তাহলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ!

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ভাবল রংকিনী।

ওরা দুজনেই জানালাতে ঝুঁকে পড়ে বাইরে দেখতে লাগল। প্লেনের মধ্যের ঐ দুপ-দাপ হুড়োহুড়িটা, অনেক যাত্রীই নিজের নিজের সিট ছেড়ে যেদিকে সুন্দরতর দৃশ্য সেদিকের জানালার দিকে ভিড় করার প্রবণতার জন্যেই হচ্ছিল। স্টুয়ার্ডেসরা মিষ্টি কথার বকা-ঝকাতেও যখন যাত্রীদের সামলাতে পারছিলেন না তখন ক্যাপ্টেনকে নালিশ করে দেবার ভয় দেখালেন। প্রত্যেককে সিট-বেল্ট পরে নিজের নিজের সিটে বসে থাকতে নির্দেশ দিলেন তাঁরা কঠিন মুখে।

ক্যাপ্টেনও বললেন, অডিও-সিসটেমে যে, সকলে স্থির হয়ে না বসলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এমনভাবে প্লেনটা এ-পাহাড় সে-পাহাড়ের মাথা টপকে, বগলতলি দিয়ে, কান ঘেঁষে একবার ডানদিক একবার বাঁদিক, একবার উঁচু, একবার নিচু হয়ে উচ্চতা হারাতে হারাতে নামতে লাগল যে সত্যিই মনে হল প্লেনের মধ্যে ঐ সময়ে অমন হুড়-দাড় করলে, ভারসাম্য হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়।

তারপরেই, দুটো পাহাড়েব মাঝ দিয়ে গিয়ে দুটি পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে হঠাৎই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিভৃত স্তনসন্ধিতে উঁকি মারল জেট-এঞ্জিনের বোয়িং প্লেনটা।

চুমকি স্বগতোক্তির মতন বলল, তুই কি সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জে গেছিস কখনও?

রংকিনী মাথা নাড়ল।

তারপর বলল, না। বেড়াতে আর কোন দেশেই বা গেছি! কাজে গেলে তো এক মুহূর্তও অবসর জোটে না। একবার হাজারীবাগ আর একবার রিখিয়াতে বেড়াতে গেছিলাম। ওঃ, মনে পড়েছে। একবার বান্ধবগড়ে গেছিলাম। মধ্যপ্রদেশে।

রিখিয়া? সেটা আবার কোথায়?

চুমকি বলল, ভুরু তুলে।

যশিডির কাছেই। ইরা মাসিদের বাড়ি আছে। সেখানে পাখি আছে অনেক। খুব নির্জন জায়গা। সুন্দর। যদিও একটু ন্যাড়া-ন্যাড়া।

ইরা মাসি কে?

কবি বিষ্ণু দের বড় মেয়ে।

ও! আমি চিনি না। আমি ক'জনকেই বা চিনি!

তারপর বলল, সেশ্যেলস-এ বাবা একবার আমাদের নিয়ে গেছিলেন। তখন বাবা তানজানিয়ার ডার এস সালাম-এ কী যেন একটা "টার্ন-কি প্রজেক্ট" করছিলেন।

সেশ্যেলস?

হ্যাঁ রে। সে যে কী পরীর দেশ, তোকে কী বলব। 'মাহে' এয়ারপোর্টের উপরে প্লেনটা যখন নামতে থাকে নানা সবুজ দ্বীপের মধ্যে মধ্যে, তখন যেন সমুদ্রের একেক রকম রঙ ফুটে ওঠে। স্বপ্নেও বুঝি এতো সুন্দর দেশ দেখা যায় না।

মানে?

রংকিনী বলল।

মানে, কোরাল রিফস আছে তো জলের নিচে! কোনও জায়গাতে কোরালের রঙ গাঢ় সবুজ, কোথাও ফিকে নীল, কোথাও গোলাপি, কোথাও কমলা। সত্যি! দেখে মনে হয়, কোনও স্বপ্নের বা রূপকথার দেশেই বুঝি এলাম।

জলের নিচে রাজপুত্র নেই?

রংকিনী বলল।

আরে, রাজপুত্র তো আছে সব জায়গাতেই। আমরা এই পোড়ারমুখীরা খুঁজে পাই না, এই যা!

বলেই বলল, কোরালের বাংলা কি রে, জানিস?

প্রবাল।

ও হ্যাঁ। তাইত। ভুলেই গেছিলাম।

তারপর বলল, আমার বাবার একটি কবিতার বই ছিল : "প্রবাল দ্বীপে একা।" আশ্চর্য! অথচ জীবনে কখনওই প্রবাল দ্বীপ দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর।

রংকিনী বলল, হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়ে।

দেখেছেন। দেখেছেন। উনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে কল্পনায়। কবিরা তো আমাদের মতন রিয়্যাল, মানডেন জগতের বাসিন্দা নন। কল্পনাতে দেখাই তো আসল দেখা! ইয়ারো আনভিজিটেড! মনে নেই?

সেশ্যেলস দেশটা কোথায়? রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

এখন তো কেব্‌ল-টিভির দৌলতে সকলেই ঘরে বসে ট্রাভেল চ্যানেল খুলে সেশ্যেলস-এ বেড়িয়ে আসে। তবে যে যাই বলুন, নিজের পায়ে ভর করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো আর ঘরে বসে টিভিতে সেই দেশ দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। নিজে পায়ে হেঁটে কোনও জায়গাতেই না ঘুরতে পারলে উ্য ক্যানট হ্যাভ দ্যা "ফিল" অফ দ্যা প্লেস।

তা ঠিক। তবে জায়গাটা কোথায় তা তো বলবি।

পৃথিবীর ম্যাপে তোকে খুবই কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে। ভারত মহাসাগরে মরিশাস, জাঞ্জিবার আর আফ্রিকার মধ্যে সরষে দানার চেয়েও ছোট গোটাকয় বিন্দু দেখতে পাবি। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখাই বোধহয় সুবিধা।

কেন? ওরকম কেন?

ঐরকমই। জানি না, পৃথিবীতে অত ছোট দেশ আর আছে কি না! অমন দ্বীপপুঞ্জ সম্ভবত আর নেই।

তারপরই বলল, ঐ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নাম ভিক্টোরিয়া। দ্বীপের নাম মাহে। ছোট হলে কী হয়! এতো সুন্দর সমুদ্রতট পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাও হার মানে। একসময়ে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল সেশ্যেলস। এখনও ওখানকার নানা জায়গাতে, অনেক কম্পানি ফ্লোট করে অনেকেই জলদস্যুদের পুঁতে-রাখা গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছে।

তাই?

ইয়েস ম্যাম।

রংকিনী বলল, সত্যি! তোর সঙ্গে যে এয়ারপোর্টে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি। তোর তো পৃথিবীতে অদেখা দেশ খুবই কমই আছে। তা এতো দেশ থাকতে তুই আন্দামানে আসা ঠিক করলি কেন?

আমি তো আন্দামানে প্রায় প্রতি বছরই আসি। ছুটি কাটাতে তো আসিনি! কখনও কখনও একাধিকবার। বিশেষ করে, গত পাঁচ বছরে। মানে, আসতে হয়ই। এটাও কাজ বলে ধরতে পারিস। আমার ঠাকুমার নারকোল গাছের বাগান ছিল এখানে। খুবই শিক্ষিতা কিন্তু বিষয়ী মহিলা ছিলেন তিনি। জলের দামে কিনেছিলেন আজ থেকে ষাট বছর আগে। একটি আস্ত দ্বীপ বুঝলি! গত বছর তো ঠাকুমা দেহ রেখেছেন। আমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে ঐ দ্বীপটি দিয়ে গেছেন আমাকে ঠাকুমা।

বিয়ের যৌতুক মানে?

মানে, আমার যবে এবং আদৌ যদি বিয়ে হয়। সেটা নাও হতে পারে। তবে সম্পত্তিটা হয়েছে।

তুই দ্বীপ-কুমারী! গোটা দ্বীপই যখন দিলেন তখন প্রবাল দ্বীপের রাজপুত্রও দিতে দোষ কি ছিল? গল্পের মতনই শোনাচ্ছে। সত্যি।

কয়েক লক্ষ নারকোল গাছই ছিল শুধু। অন্যান্য অগণ্য জংলি গাছ তো ছিলই। তা আমারই সম্পত্তি যখন তার দেখাশোনার দায় তো এখন আমারই।

তুই একটা পুরো দ্বীপের মালিক! ভাবা যায় না! পুরুষ হতাম যদি তো শুধু এইজন্যেই তোকে বিয়ে করতাম।

ছেলেবেলাতে ঠাকুমা নিজেই দেখাশুনো করতে আসতেন। আমাকেও নিয়ে আসতেন স্কুল বা কলেজ ছুটি থাকলে। তবে এবারে আমি আন্দামানে বেড়াতেও আসিনি, প্ল্যানটেশানের কাজ দেখতেও যাচ্ছি না। কারণ, একজন হোলটাইম ম্যানেজার রেখেছি। তিনি থাকতে কারোই আর কিছুই দেখার দরকার নেই।

তবে কী করতে এসেছিস এবারে?

এবারে এলাম শুধু তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। জাস্ট টু সে "হাই"।

বাবাঃ। এমন করে বলছিস যেন "দর্শনে" এলি কারো। কোনও দেব-দেবীরই বুঝি? আফটার অল, তিনি তো তোর কর্মচারীই, যে নামেই ডাকিস না কেন তাঁকে।

ঠিক তা নয়, তা নয় রে রংকিনী। এমন অনেক কর্মচারীও থাকেন যাঁরা মালিককেই ধন্য করেন, এমন অনেক পুরস্কার-প্রাপকও যাঁরা পুরস্কারদাতাকেই মান দেন তা গ্রহণ করে।

.কোনও বয়ফ্রেন্ড? ওল্ড ফ্লেম? কে তোর সেই ম্যানেজার? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

তুই কলেজের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে একবার একটা গান গেয়েছিলি না? "যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে।" ফ্লেম একবারই জ্বলল না এখনও তার আবার ওল্ড আর নিউ। ভালই বলেছিস তুই। হেসে বলল, চুমকি।

রংকিনী বলল, বাজে কথা বলিস না।

কী বাজে কথা! আগে আমরা জানতাম না? "Sweet Seventeen yet unkissed." হায়। হায়। আমি এখন সুইট থার্টিফোর অথচ ইয়েট আনকিস্‌ড। কেউ বিশ্বাস করবে? বল?

রংকিনী হেসে উঠল চুমকির কথাতে। এইরকম করেই কথা বলে ও সেই স্কুলের দিন থেকেই।

চুমকির বাবার বিশ্বজোড়া ব্যবসা। কোটিপতি মানুষের মেয়ে, নিজেও নিজের দাবিতে কোটিপতি না হলেও মিলিয়নিয়র তো অবশ্যই। কিন্তু শিশুকাল থেকেই কোনওরকম চালিয়াতিই করতে দেখেনি রংকিনী চুমকিকে। চমৎকারভাবে মানুষ করেছিলেন মাসিমা তাদের এক ছেলে আর দুই মেয়েকে। এমন বড় একটা দেখেনি রংকিনী বাঙালি কোটিপতিদের মধ্যে, যদিও তার কাজের সূত্রে অনেক কোটিপতিদের সঙ্গেই মিশতে হয়েছে ও হয়।

চুমকি বলল, সত্যি। আমরা এক্কেরেই যা তা।

রংকিনী বলল, আমি তো তোর চেয়েও এক বছরের বড়। প্রায় বুড়িই বলতে পারিস। বিয়ে-টিয়ে ছেড়ে দে, আজ পর্যন্ত একটা "অ্যাফেয়ার"ই হল না।

শারীরিক অ্যাফেয়ারের কথা বলছিস?

দুস্‌স্। সে তো কুকুরীদেরও হয় যখন তখন। মনের অ্যাফেয়ারের কথা বলছি। রিয়্যাল অ্যাফেয়ার।

এমন মুখ করে রংকিনী কথাটা বলল, যেন ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা এক প্লেট চালতাই কেউ নিয়ে গেল ওর হাত থেকে ছিনিয়ে।

রংকিনী বলল, সত্যি! আমাদের মতন কেরিয়ার-গার্লদের বিয়ে টিয়ে করা পোষায়ও না। এই তো রিমা বিয়ে করল সেদিন!

কোন রিমা?

আরে প্রেসিডেন্সির। আবার কোন রিমা? বাচ্চাও হল। বাচ্চাটাকে একেবারেই দেখতে পারত না। হাউ ক্রুয়েল অফ হার। লোকে কুকুরের বাচ্চাকেও ওর চেয়ে যত্ন করে মানুষ করে। বাচ্চা যখন ছ'মাসের তখনই তার বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে নাকি হোমো হয়ে গেছে। শ্যামল সেনগুপ্ত। আ স্টুপিড গাই। আমি অবশ্য একবারই মিট করেছি তাকে। কী করে যে রিমা অমন একটা শিংহীন হাম্‌বাগ ছাগলকে বিয়ে করল জানি না।

ইসস্। বলিস কি? হাউ স্যাড।

আর স্যাড! সারা পৃথিবী জুড়েই তো এখন ছাগলদের রাজত্ব। হোমো আর লেসবিয়ানদেরও রাজত্ব। সমস্তরকম স্বাভাবিকতাকেই পশ্চিমী পৃথিবী বিসর্জন দিতে বসেছে। আমরাও অন্ধের মতন অনুগমন করছি তাদের। আমার আন্দামানে আসা তো এই জন্যেই। সেই মানুষটার সঙ্গে দুটো কথা বললেই আমি সঠিক পথের নির্দেশ পাই। আই ক্যান কারেক্ট মাই বেয়ারিংস। আই মিন ইট। রিয়্যালি!

রংকিনী একটু অবাকই হল। তাকিয়ে থাকল চুমকির মুখের দিকে। এমন সময়ে ওর বিস্ময়কে বোমার মতন বিস্ফারিত করে প্লেনটা ল্যান্ড করল।

ভেরি ব্যাড ল্যান্ডিং।

চুমকি স্বগতোক্তি করল।

ব্রেকও করল ক্যাপ্টেন খুবই জোরে। পাখির ডানার মতন ডানা উঁচিয়ে প্লেনের ব্রেক যখন কাজ করে তখন দেখতে বেশ লাগে।

এয়ারপোর্টটি যথেষ্ট লম্বা নয় এবং সেইজন্যেই অত জোরে ব্রেক করতে হল হয়ত।

ভাবল, রংকিনী।

প্লেনটা ট্যাক্সিইং শেষ করে টারম্যাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পার্কিং-বে তে এসে যখন নিশ্চল হল, ওরা নিজেদের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে উঠল সিট ছেড়ে।

প্লেনের বাইরে এসেই খুব ভাল লাগল রংকিনীর। ভারি শান্ত জায়গা। সমুদ্রের মধ্যে ঘন সবুজ পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপ। মাঝে মাঝে সবুজ কাঁচুলি ঘেরা লাল মাটির বুককে চিরে কালো পিচ-এর পথ চলে গেছে। শান্ত, নির্জন, অন্যরকম।

রংকিনী স্বগতোক্তি করল, বাঃ। এতোদিনে আসা হল আন্দামানে!

BAY ISLAND RESORTS-এর মাঝারি সাইজের বাসটি দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টের বাইরে। লাগেজ এলে, দুজনে নিজেদের লাগেজ শনাক্ত করার পরে হোটেলের লোকই লাগেজ নিয়ে গিয়ে বাসে তুলল। তারপর ওরা দুজনে হ্যান্ডব্যাগ হাতে সেই বাসের দিকে এগোল। উপরে সুনীল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। হু হু করে হাওয়া আসছে আড়ালে-থাকা সমুদ্র থেকে। অবকাশ, অবসর, নিজেকে, নিজের বড় ভালবাসার শরীর এবং মনকে পুনরাবিষ্কারের ছুটি।

খুব জোরে একটি প্রশ্বাস নিল রংকিনী আকাশে মুখ তুলে।

ড্রাইভার এসে বসল ড্রাইভিং সিট-এ। বাসটা ছেড়ে দিল। মাসটা ডিসেম্বর হলে কী হয়, বেশ গরম। রোদ, এই সকালেই চড়া। তবে হু হু হাওয়া আছে। সমুদ্রপারে যেমন হয়। লক্ষ করল রংকিনী যে, এই হাওয়াটা তেমন আর্দ্র নয়। যেমন হবে ভেবেছিল।

কেন যে নয়, তা ও বলতে পারল না।

৩

"হর্ণেট্‌স নেস্ট" দ্বীপ থেকে পোর্টব্লেয়ারে যখন কাজে আসতে হয় আহুককে তখন সেদিনেই ফেরা যায় না বলেই রাতটা বে-আইল্যান্ড হোটেলেই থাকেন। তার মালকিন চুমকি রায়-এর তেমনই ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এই হোটেলে। টাকা তাকে দিতে হয় না। সই করে দেন বিল। কলকাতার অফিসে বিল চলে যায়, সেখান থেকেই পেমেন্ট আসে সরাসরি।

ভোর কি হয়ে এল?

রেডিয়াম-দেওয়া হাতঘড়িটা বেডসাইড টেবল থেকে তুলে ইচ্ছে করলেই দেখতে পারতেন। কিন্তু দেখলেন না। সাম্প্রতিক অতীত থেকে সময়কে নিঃশর্ত ছুটি দিয়ে দিতে ইচ্ছে যায়। আসুক দিন, যখন তার খুশি, যদি তার ইচ্ছে হয়।

রাতের বেলাই এইরকমই মনে হয় আহুক-এর। রাতে বিছানা ছেড়ে উঠলে, জানালার পাশে বা বারান্দাতে এসে দাঁড়ালে আজকাল প্রায়ই এরকম হয়। যৌবনের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলার বই-এর উপরে সাঁটা জলছবিরই মতন। কিন্তু সেই সব ছবি অতীতকালের ছবি। স্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে বহুবর্ণ কিন্তু প্রাণহীন প্রজাপতিরই মতন সেঁটে গেছে। আজ তারা উঠে এসে, জীবনে এঁটে বসবে যে, তার কোনওই উপায় নেই। সাধ্য নেই কারোই যে, সেইসব ছবি অতীত থেকে তুলে এনে তাঁর আজকের জীবনে ফিরিয়ে আনে। অন্য কারো তো নেই-ই, আহুক-এর নিজেরও নেই।

শেষ রাতে আবারও উঠলেন তিনি পোর্ট ব্লেয়ারের এই বে-আইল্যান্ড হোটেলের সমুদ্রমুখী ঘরের বিছানা ছেড়ে! টয়লেটে গেলেন। নিশুতি রাতে ফ্লাশ-টানার শব্দে দু-একবার নিজেই চমকে উঠলেন। ভয় পেলেন যে, পাশের ঘরের মধুচাঁদা দম্পতির ঘুম বুঝি ভেঙে যাবে। হয়ত ভেঙে যাবে এই নিদ্রামগন দ্বীপের রাতের ঘুমও। লজ্জা হয়, নিজের ইনকনসিডারেশানের জন্যে, নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে এইরকম আকস্মিক জলজ শব্দ করার জন্যে। আসলে, দূর সমুদ্রে এক জনমানবহীন দ্বীপে একেবারে একা থেকে "কনসিডারেশান ফর আদারস" কথাটাই তিনি ভুলে যাচ্ছেন। জংলি স্বভাবের তিনি চিরদিনই ছিলেন। এখন নব্বই ভাগ জংলি হয়ে গেছেন স্বভাবে, চরিত্রে। আরও কিছুদিন থাকলে হয়ত আন্দামান নিকোবরের ওঙ্গে, শোম্পেন এমনকি জারোয়াদেরই মত হয়ে যাবেন।

পুরোপুরি জংলি হওয়া বড় সুখের। মুশকিল এই আহুকদের মতন আধা-জংলিদেরই!

জীবনের পথে বহুদূর হেঁটে আহুক বোস আজকে বুঝেছেন যে, একজন মানুষ, সে মানুষ যদি প্রকৃতই সৎ হন, যদি ভণ্ড ও খল না হন, যদি মিথ্যাচারী না হন, তবে তিনি নিজেকে যতখানি ঘৃণা করেন সেই ঘৃণা তাঁর প্রতি পৃথিবীর অন্য সকলের ঘৃণার যোগফলের চেয়েও অনেকই বেশি হয়। ব্যাপারটা বৈপরীত্যের সংজ্ঞা যদিও। কিন্তু সত্যি। একশো ভাগ সত্যি।

আশ্চর্য! তেষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে আজ কত কী-ই না ভাবেন, বোঝেন তিনি, যেসব ভাবনা পঞ্চাশে বা চল্লিশে বা তিরিশেও ভাববার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। একজন পাঁচটি যুগ পার হয়ে এসে, নিজের আয়ুর প্রায় সবটুকুই খরচ করার পরে যা বোঝেন, যা জানেন, তা তার পক্ষে আগে ভাবা বা বোঝা বোধহয় আদৌ সম্ভব হয় না। অথচ এমনই ঋতি এবং রীতি এই মনুষ্য জীবনের যে তাঁর চেয়ে কমবয়সী কারো হাতেই তাঁর জীবনময় অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও তুলে দিয়ে যাবেন যাবার আগে, তাও হবার নয়। হয়ত সব মানুষের চরিত্রই এই যে, অন্যের শিক্ষাতে শিক্ষিত হতে তাঁরা কেউই আদৌ চান না। যা তাঁরা শেখেন, যতটুকু শেখেন, তা নিজেরই হাত পুড়িয়ে, ভুল কুড়িয়ে। আহুক-এর তাই যেমন অন্যের কাছেও শেখা হয়নি কিছু তাঁর নিজের জীবনভর অভিজ্ঞতাও শেখানো হয়নি কারোকেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে একজনও শিখতে চায়ওনি।

পোর্ট ব্লেয়াবের বে-আইল্যান্ড হোটেলের এই সমুদ্রমুখী ঘরটার একদিকে সিলিং থেকে নীচ অবধি কাচের স্লাইডিং-ডোর, যেদিকে সমুদ্র। সেই কাচের দরজা খুললেই একটি সমুদ্রমুখী বারান্দা। পর্দাটা সরিয়ে, বাতানুকূল ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন উনি। শেষ রাতে এখন বাইরের সমুদ্রর উপরে এলোমেলো হাওয়া, তবে গরম তেমন নেই। সন্ধের পরই ঠাণ্ডা হয়ে যায় যদিও তবু ঐ হাওয়ার এলোমেলোমি থেকে বাঁচতেই স্লাইডিং-ডোর টেনে এয়ার কন্ডিশনার চালিয়েই শুয়েছিলেন। আইল্যান্ডটি ডানদিকে দেখা যাচ্ছিল একটি অন্ধকার পিণ্ডর মতন হোটেলের স্যুইমিং পুল-এর পাশের ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে। আজ শুক্লা পঞ্চমী কিন্তু পূর্ণিমাতেও দূর সমুদ্রের দ্বীপকে রহস্যময় এবং কালোই দেখায় দূর থেকে।

এলোমেলোমি আর অগোছালোমিই একদিন আহুক বোস-এর জীবনের নিশান ছিল অনেকই দিন। এখন এলোমেলোমিকে উনি খুবই ভয় পান। জীবনের সব ক্ষেত্রেই পা ফেলার আগে বহুবারই ভাবেন। সাহস কমে গেছে। কমে গেছে শরীরের বল। রিপুরা একে একে ঘুমোতে যাবার তোড়জোড় করছে। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে নিজেকে, নিজের পরিবেশ প্রতিবেশকে একটু গোছগাছ করে রেখে যেতে চান। যেন কেউই না বলতে পারে যে, মানুষটা পৃথিবীকে মলিন করে দিয়ে গেছিল। মনে পড়ে যায় যে, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া স্ত্রী টিটিঙ্গি খুবই গোছানো ছিল। এই সংসারে কার যে কোনটা গুণ আর কোনটা দোষ তা যখন বোঝা উচিত তখন আদৌ বোঝা যায় না। বোঝা যায় অনেকইদিন পরে। যখন সে মরে যায়, কী ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তখন

ভুল শোধরাবার আর উপায় থাকে না কোনও। তখন বোঝেননি, বোঝেন এখন। অন্যকে বুঝতে বুঝতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই জীবন। সময়ে যদি বোঝা যেত তবে কী সুন্দরই না হতো সকলেরই জীবন।

আজকে বিকেল থেকেই সমুদ্র ভারি অশান্ত। অবিরত বড় বড় ঢেউ ভাঙছে। কত যুগের অব্যক্ত প্রেম আর বিরহ, হাসি আর কান্না যেন গুমরে গুমরে ওঠে বালুবেলাতে সমুদ্রের ভেঙে-পড়া ঢেউগুলির বুকের মধ্যে থেকে। ফসফরাস হঠাৎ হঠাৎ আলতো উজ্জ্বল হাত বুলিয়ে দিয়ে যায় ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের অগণ্য ঢেউয়ের মাথাতে আর গায়ে, কোনও নারীর চকিত প্রেমের অস্ফুট অভিঘাতের মতন। তারপর লোলচর্ম বুড়ির স্বগতোক্তির মতন বিজবিজ—ফিস ফিস করে সমুদ্র চাপা কান্না কাঁদে, তটে গড়াতে গড়াতে। মৎস্যগন্ধী হাওয়াতে তটময় দৌড়ে-বেড়ানো কাঁকড়ারা তাদের ছোট ছোট বাঁকা হাতে সান্ত্বনা দিতে যায় চিরদিনের একা সমুদ্রকে। কিন্তু সমুদ্র সান্ত্বনা নেয় না কারোই, যদিও সে জন্ম-একা, যদিও সে অনাদিকাল থেকেই এমনই নিরবধি নিরুচ্চারে কাঁদে।

এই বাবদেই আহুক বোস ভাবেন সমুদ্রর সঙ্গে তাঁর যেন মিল আছে কোথায়। সমুদ্র এবং তাঁর নিজের একলা বুকেও এপর্যন্ত অনেকই এঁটেছে। জীবনে অনেকই পেয়েছেন সমুদ্র এবং আহুকও। কিন্তু কোনও প্রাপ্তিকেই তাঁদের ক্ষুদ্র মালিকানার ঘেরাটোপে শুধুমাত্র নিজেদেরই কুক্ষিগত করে রাখবার মতন নীচ মনোবৃত্তি ছিল না তাঁদের দুজনের কারোই। যা কিছুই সমুদ্র নেয়, তা আবার ফিরিয়েও দেয় অবলীলায়, সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে। সে ফুলই হোক, কী শব।

এমন এমন রাতে, আজকাল এমন এমন এলোমেলো ভাবনা হঠাৎ-ভাঙা ঢেউয়ের মাথাতে ঝিলিক দিয়ে ওঠা ফসফরাস-এরই মতন হঠাৎ হঠাৎই তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলে উঠেই নিভে যায়।

সমুদ্র মস্ত বড়, গহন, গভীর। অসীম তার রহস্য। সর্বগ্রাসী জিগীষা নিয়েও মানুষ এখনও তল পায়নি এই অতল রহস্যের। মধ্যরাতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে উনি ভাবছিলেন মানুষের ঔৎসুক্য বড় বেশি নোংরা। প্রকৃতির সব গোপন রহস্যই সে তার নোংরা আঙুলে ছিঁড়ে-ছেনে দেখতে চায়। মূর্খ পুরুষেরা জানে না যে, প্রকৃতির আর নারীর সব মাধুর্যই তাদের রহস্যময়তারই মধ্যে।

গতকাল দুপুরে পোর্ট ব্লেয়ারে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অসময়ের ঝড়টা হঠাৎই এসেছিল, প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে। ঐ দুর্যোগের মধ্যে মনো-এঞ্জিনের বোটে করে একা একা প্রায় কুড়ি knot দূরে তাঁর নিজের দ্বীপে পৌঁছনোর চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা সমার্থকই ছিল। তাঁর জীবন এখন শীতের সমুদ্রের মতন টানটান। পানাপুকুরের মতন স্থির, কোনও আলোড়ন আর উঠবে না তাতে, তবু আত্মহত্যা করার কোনও ইচ্ছে নেই তাঁর। জীবনের গতি-প্রকৃতির কথা আগে থাকতে কেই বা বলতে পারে! কার জীবনে কখন যে আগে থাকতে কী ঘটে তা জানা যায় না বলেই তো এখনও জীবন এতো ইন্টারেস্টিং।

যেমন হঠাৎ দুর্বার অভিমানের মতন সে ঝড় এসেছিল দুর্বোধ্য প্রেমিকের মতন সে হঠাৎই চলে গেছে রাত নামার পর পরই। এখন মধ্য-রাতের আকাশ পরিষ্কার। পোর্ট ব্লেয়ারের Bay-র শেষে সমুদ্রের বিভাজক পাহাড়টির শেষ প্রান্তেব নিদ্রাহীন লাইট হাউসটির আলো নিশ্চিত নিখুঁত গতি এবং যতিতে সমুদ্র এবং এই পোর্ট ব্লেয়ারকে তীব্র ঝলকানির নিঃশব্দ চাবুক মেরে যাচ্ছে বারে বারে। সেই চাবুক পড়ছে তাঁর ঘরেও। আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল-এর ওয়াচ টাওয়ারের প্রহরীরা একসময়ে আলোর চিরুনি বুলিয়ে বুলিয়ে সেখানকার দেশপ্রেমী মুক্তিকামী কয়েদীদের সারারাত ত্রস্ত এবং বিন্যস্ত করে রাখত। বহুদূরের বাতিঘরের আলোর চাবুক কার বা কাদের বিন্যস্ত করতে চায় কে জানে!

আরেক ঘুম দিয়ে উঠলেই ভোর হয়ে যাবে। সকাল চারটেতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতেই ভোরের হাওয়াটা যেন জোর হয়। এই সময়ে 'চিড়িয়া টাপু'তে থাকলে কত বিচিত্র সব পাখির স্বর শোনা যায়। পাখি অবশ্য তাঁর দ্বীপেও অনেকই আছে। তবে যে-পাখির খোঁজ করতে এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আহুক এসেছিলেন সেই পাখির দেখা আজও পাননি। হয়ত পাবেনও না। জীবনের বেলা তো পড়ে এল। প্রত্যেক মানুষই সারা জীবন ধরে কোনও না কোনও পাখি খোঁজে। সেই পাখি হরেক রকম হয়। কেউ তার পাখিকে পায়, কেউ পায় না। কিন্তু খোঁজে সকলেই।

আবার তিনি শুয়ে পড়লেন পর্দাটা টেনে দিয়ে। বাতিঘরের এই চাবুক-মারা আলোটা সব কেমন বে-আব্রু করে দিয়ে যায়, অবিন্যস্তও।

প্রথম যৌবনের অভ্যেসবশেই আহুক সম্পূর্ণ নগ্ন না হয়ে শুতে পারেন না। দূরাগত দ্বীপের সেই প্রবল শক্তিশালী আলো তার নগ্নতাকে তাঁর নিজের কাছেও উন্মোচিত করুক, তা চান না তিনি। এই রাতভর আলোর চাবুককে তিনি সহ্য করতে পারেন না। হিমালয়ান ভাল্লুকের মতন একজন রোমশ পুরুষও যে এমন প্রজাপতির মতন লাজুক হতে পারেন একথা ভাবলে তাঁর নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। সর্ব-উন্মোচনকারী আলোকে সইতে পারেন না। কারণ, এ আলো শুধু তাঁর শরীরই নয় মনের নিভৃত ঘরেও উঁকি মারে, গোপনীয়তাকেও ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেয়।

ভোর হবে আজও। প্রতি রাতেই শুতে যাবার আগে পরদিন ভোরের জন্যে প্রার্থনা থাকেই প্রত্যেক মানুষেরই মনে। কার জন্যে কী যে বয়ে আনবে সেই ভোর, তা কে জানে!

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন আহুক। পাশের খাটের বালিশটিকেও টেনে নিলেন পাশবালিশ করে। আজ অনেক বছর হয়ে গেল বালিশের সঙ্গেই তাঁর শোওয়া। এই বন্দোবস্তেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন পুরোপুরি। বালিশের উপরে মাথা দেওয়া মানুষের মুখ বড়ই অস্বস্তি ঘটায়। আরামের ব্যাঘাত ঘটায়। পুরনো দিনে, লখনউয়ের নবাব পরিবারের স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই 'গল তাকিয়া' ব্যবহার করতেন। হয়ত আজও করেন। পাশ ফিরে শোবার সময়ে গালের নিচে নীলনদের উপত্যকার কাপাস তুলো

দিয়ে বানানো সেই আতরগন্ধী রেশমী ওয়াড়-পরানো পাতলা বালিশ নিয়ে শুতেন তাঁরা। দু-উরুর মাঝে পাশবালিশ তো থাকতোই, একটু উষ্ণতার জন্যে।

এই মুসলমান জাতটার বড় ভক্ত আহুক। না, হাজারীবাগের ফিরদৌসী একদিন তাঁর প্রেমিকা ছিলেন বলেই নয়। অন্য নানা কারণেও। এই জাতটা বাঁচতেও যেমন জানে, মরতেও জানে। ত্যাগের চরম যেমন করতে জানে, ভোগেরও চরম। বড় জিন্দা-দিল, মন-মৌজী জাত এই মুসলমানেরা। চান করা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া, গান-বাজনা মনের এবং শরীরের প্রেম সব ব্যাপারেই এঁদের এক বিশেষ স্বকীয়তা আছে। এরা নকলনবীশ আদৌ নন।

কে জানে! কেমন আছে হাজারীবাগের ফিরদৌসী? তারও তো ষাট বছর বয়স হতে চলল। নাতি-নাতনী নিয়ে ভরা সংসার। চুল পেকে গেছে নিশ্চয়ই। তবে ফিরদৌসীর চুল পাকলে পাকা পাটের মতন সোনালি হবে সে চুল, শনের মত সাদা হবে না। হয়ত কিছু দাঁতও পড়ে গেছে। চোখে উঠেছে চালসে চশমা। হয়ত। তা হোক। ভালবাসার জনকে পাকা-চুলে, ভাঙা দাঁতে দেখতে আরও বেশি ভাল লাগে। কলপ যারা লাগায়, কী পুরুষ কী স্ত্রী, সেই মানুষগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড হয়। আহুক, ভণ্ডামির মতন ঘৃণা আর কিছুকেই করেন না। অথচ ভণ্ডদেরই তো রাজত্ব এখন।

চারদিকে সমুদ্রঘেরা এক নির্জন দ্বীপে থাকেন বলে সুখেই আছেন তিনি। নানারকমের সুখে। তাঁর মনের বনের মধ্যেই যে সব চেনা-অচেনা অন্য প্রাণীদের বাস তারা ছাড়া বাইরের কেউই পারে না তাঁর শান্তি নষ্ট করতে।

আবারও একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন উনি নানা অসংলগ্ন ভাবনার এলোমেলোমির অলিগলিতে হারিয়ে গিয়ে। যখন জাগবেন তখন আর স্বপ্ন থাকবে না কোনও। থাকবে না কোনওরকম অহঙ্কারের বা হীনম্মন্যতার অস্পষ্টতাও। দিন বড় বেশি স্পষ্ট। রাতের বেলার তাঁর প্রতি-রাতের নগ্নতারই মতন। নগ্নতা বা দিন সুখের এবং নিশ্চিন্তির হয়ত হতে পারে, আরামেরও হতে পারে, কিন্তু সুন্দর কখনওই নয়। যেখানে অথবা যাতে অস্পষ্টতা নেই, রহস্য নেই, অতি সামান্য হলেও, আড়াল নেই, তাকে সুন্দর বলে কখনওই মানা যায় না। আহুক অন্তত মানেন না।

কাল সকাল কি ওঁর জন্যেও সুন্দর কিছু বয়ে নিয়ে আসবে? নতুন কিছু? প্রতি রাতেই মাঝরাতে উঠে যখন দ্বিতীয়বার ঘুমোন তখন এই ভাবনা আসে তাঁর মাথাতে।

"বিফল সুখ আশে জীবন কি যাবে? কবে আসিবে হরি, কবে পথ দেখাইবে" অতুলপ্রসাদের সেই গানখানি মনে আসে। নীপুদিদি বড় ভাল গাইত গানটা। নীপুদিদি এখন কোথায় কে জানে। ভরা তেইশ বছর বয়সে হাজারীবাগের রিফর্মেটরির লেক-এ ডুবে মরেছিল। গলাতে পাথর বেঁধে, লাফিয়ে পড়েছিল জলের উপরে ঝুঁকে-পড়া একটা পিপ্পল গাছের ডাল থেকে। পাশের বাড়ির নীপুদিদি খুব ভালবাসত আহুককে। জীবনে অনেক নারীর ভালবাসাই পেয়েছেন আহুক আজ অবধি কিন্তু সে এক অন্যরকম ভালবাসা, ভোরের শুকতারার মতন।

সমুদ্রে যখন মাছ ধরার জন্যে একটা নৌকো নিয়ে ভেসে যান আহুক, যখন সন্ধে হয়ে আসে, নীল-সবুজ জল যখন বিষণ্ণ কালো হয়ে ওঠে, যখন সন্ধেতারাটা ওঠে সামুদ্রিক দিগন্তে, তখন কোনও কোনও সন্ধেতে নীপুদিদি তাঁর সঙ্গে কথা বলে জলের নিচ থেকে। নীপুদিদি মাত্র দু'বছরের বড় ছিল আহুক-এর চেয়ে।

চারদিকে সমুদ্রঘেরা আন্দামানের এইসব দ্বীপে, এই নির্মম নির্জনতায় এখনও অনেকই রহস্য বেঁচে আছে। সেইসব রহস্য কখনও কখনও ভয় পাওয়ায় মানুষকে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আনন্দও জোগায়। অনাবিল আনন্দ। সেই আনন্দকে এই সব দ্বীপের বিষণ্ণতারই মতন ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

বোঝাই যায় না, আর বলা!

৪

চুমকি আর রংকিনী পোর্ট ব্লেয়ারের একটি পাহাড়ের উপরের বে-আইল্যান্ড হোটেলের রিসেপশনের একতলা নিচের, সমুদ্রমুখী, দেওয়ালহীন বসার ঘরে একেবারে রেলিং ঘেঁষে বসেছিল। যাতে, সমুদ্রের সবচেয়ে কাছে বসা যায়। এখান থেকে ঢিল ছুড়লেই সমুদ্রে পড়ে। বাঁদিকে BAR। এই বার-এ হোটেলে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ছাড়া বাইরে থেকেও কিছু মানুষে আসেন। তবে সভ্য-ভব্য। 'বার' শব্দটাই যেমন অনেকের মনে ভীতির উদ্রেক করে তেমন ভীতিজনক নয় এই বার। বার-এ ভিড়ও খুব কম।

দুপুরের খাওয়ার পরে সেলুলার জেল দেখে এসে, আকুয়া-স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ সমুদ্রের মধ্যে স্পিডবোট চালানোর পর ঐ হোটেলেরই একটি টাটা-সুমো গাড়িতে চেপে ওরা হোটেলে ফিরে চান-টান করে এসে এখন বারান্দাতে বসেছে। সকালে প্লেন থেকে নামার পরে ব্রেকফাস্ট করে ঘুম লাগিয়েছিল। কী ঘুমেই যে ধরেছে ওদের! অবিরত টেনশনে টানটান স্নায়ু এই ছুটিতে, এই নির্জনতায় এই অবকাশে যেন একেবারে শ্লথ হয়ে গেছে। দিলরুবার তার সব ঢিলে করে দিলে কোনো ভ্যাবাচ্যাকা কাচপোকা তাতে উড়ে এসে বসলেও তা ঝংকৃত হয় না তেমনই এখন ওদের মন ঢিলে হয়ে গেছে। সায়ার বা সালোয়ারের দড়ি ঢিলে দিলে যখন মন শুধু ঢিলেই হয় না, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত নানা ঘটনার জন্যেও তৈরি থাকে অথচ উদ্বিগ্ন থাকে না আদৌ, ওদের মনের অবস্থাও এখন প্রায় সেরকমই।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার আরও অনেকই পুবে। তাছাড়া এখানের চারিদিকেই হাজার মাইল সমুদ্র বলে তাতে দিনের আলো অনেকক্ষণ ধরে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত হয়। তাই মনে হচ্ছে, সন্ধে নামতে নামতে কম করে সাতটা সোয়া সাতটা হয়ে যাবে।

মিনিট পনেরো আগে পশ্চিমের আকাশ কালো করে বৃষ্টি এসেছিল। হাওয়া উঠেছিল এলোমেলো। বন্দরে এখনও ড্রেজিং হচ্ছে মনে হয়। একটা ছাদওয়ালা দুপাশ খোলা অদ্ভুত আকৃতির মোটরবোট গেরুয়া-রঙা বালি ভর্তি করে বন্দরের দিক থেকে এসে বাইরের খোলা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। কোথায় যে বালি ফেলছে তা হোটেলের বারান্দাতে বসে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাদে খালি বোটটা আবার ফিরে আসছে বন্দরের দিকে। কে জানে! সকাল থেকেই হয়ত যাতায়াত করছে বোটটা। ওরা দুপুরে দোতলার খোলা ডাইনিং রুমে বসে খাবার সময়েও লক্ষ্য

করেছে। বৃষ্টি এখন থেমে গেছে কিন্তু আকাশে মেঘ আছে। সেই মেঘের আড়াল ভেদ করে এক আশ্চর্য সুন্দর কোমল আলো ফুটেছে যা বসন্তের রিক্তবনের প্রাক-সন্ধের কনে-দেখা আলোর মত নয়। এ আলোর রঙটা ঠিক কমলা নয়, সাদাটে। কিন্তু অনেক বেশি বিধুর।

রংকিনী ভাবছিল, এই আলোর রঙের নামটি পৃথিবীর কোনও শিল্পীর প্যালেট খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা এ ছবি। সামনের পাহাড়টি, ডানদিকের রসস্ আইল্যান্ড, সামনের সমুদ্র সে যে কী এক আশ্চর্য সুন্দর বৈধব্যর বেশ পরেছে তা অবর্ণনীয়।

এমন সময় অশ্রুতপূব একটা আওয়াজ করে একজোড়া বেশ বড় সামুদ্রিক পাখি রসস্ আইল্যান্ডের দিক থেকে উড়ে বাঁদিকে গেল। ঝুঁকে পড়ে, পাখি দুটিকে দেখল ওরা। পাখি দুটির পেটটুকুই শুধু দেখতে পেল। রূপোলি পেট। মস্ত বড় বড় পাখি। তবে হাঁস নয়।

কী পাখি রে? জানিস?

রংকিনী জিগ্যেস করল চুমকিকে।

চুমকি বলল, এসব পাখিফাকি চেনেন মিস্টার বোস। যখন আলাপ হবে তখন বিবরণ দিয়ে জিগ্যেস করিস, তিনি ঠিক নাম বলে দেবেন।

তারপরে হেসে, দক্ষিণ-বাংলার ভাষায় বলল, পাখির মইদ্যে আমি চিনি শুধু মদনটাকী!

সেটা কি পাখি?

কে জানে? মাতলা নদী বেয়ে একবাব বোটে করে পিকনিক-এ গেছিলাম। উঁচু ডাঙ্গাতে বসে-থাকা পাখির নাম বলেছিল সারেং।

তাই?

বলেই, অন্যমনস্ক হয়ে গেল রংকিনী। কেন যে হল, তাও নিজেই জানে না।

সেলুলার জেল-এর সিঁড়ি উঠতে উঠতে চুমকি নাম বলেছিল তার ম্যানেজারের। অদ্ভুত নাম। আহুক বোস। ডাহুক পাখির কথা শুনেছে। দেখেওছে কয়েকবার বহরমপুরের মামাবাড়ির পেছনের ডোবাতে কিন্তু আহুক শব্দটি কখনও শোনেনি। কি মানে, তা কে জানে!

আহুক!

চুমকি সে ভদ্রলোক সম্বন্ধে অনেক কিছু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেও একজন বৃদ্ধ ভাম সম্বন্ধে ওর কোনও ইন্টারেস্টই জন্মায়নি। বয়সটা যদি পঁয়তাল্লিশের মধ্যেও হতো তাহলেও না হয় পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে একটা মেমোরেবল অ্যাফেয়ার হলেও হয়ে যেতে পারত। অনেকই বেলা বয়ে গেছে জীবনে অনবধানেই। অনেক সুদর্শন কৃতবিদ্য যুবক তাকে চেয়ে ফিরে গেছে। মনস্থির করতে পারেনি রংকিনী। প্রাইভেট সেক্টরে যে ধরনের প্রতিযোগিতার এবং অত্যন্ত বেশি মাইনের চাকরি সে করে, তাতে কেরিয়ার

আর বিয়ে একসঙ্গে সহবাস করে না। ও, এ জীবনে অন্য নদীতে ভেসে গেছে। এখন আর উজান বেয়ে ফেরা যাবে না। তাই এতো এবং এতোরকম যুবাকে অবহেলা করে আজ কোনও বুড়োর প্রতি কোনও কারণেই কোনও আকর্ষণ বোধ করার প্রশ্নই ওঠে না। রংকিনীর সময় বড় কমই বাকি আছে, হাতে। সেই সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনও ইচ্ছা অথবা উপায়ই তার নেই।

কী সুন্দর লাগছে, না রে রংকিনী?

চুমকি স্বগতোক্তির মতো বলল।

হুঁ।

রংকিনী বলল। স্বগতোক্তিরই মতো যেন অনেকই দূর থেকে।

তারপর বলল, কী করে সন্ধে হয়, কী করে ভোর আসে তা শুধু প্লেনের জানালা দিয়েই দেখি আজকাল। পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা ভুলেই গেছিলাম যেন। না থামলে কি এসব দেখা যায়? শুধু চলা আর চলা। অবিরত।

অনেক বছর আগে "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এ একটি লেখা পড়েছিলাম, জানিস, "হাউ ইভিনিং কাম্‌স"। কার লেখা মনে নেই, কিন্তু লেখক ঠিক এই কথাটিই লিখেছিলেন। দিন কী করে আলোকিত হয় আর সেই আলো কী করে নেভে তা দেখার সময়টুকু আমাদের কারই বা আছে আজকাল! অথচ এই সবই আশ্চর্য আনন্দর আধার। সিম্পল, ইনোসেন্ট প্লেজারস। এসব দেখার চোখই হারিয়ে গেছে আমাদের।

রংকিনী বলল অনুশোচনার গলাতে, যা বলেছিস।

চুমকি একটু চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল, একটা গান শোনাবি রংকি। কতদিন তোর গান শুনিনি।

তারপর যেন হঠাৎই মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, মনে আছে? স্কুলে আমরা রবীন্দ্রনাথের "কালমৃগয়া" করেছিলাম। তুই ঋষিপুত্র সেজেছিলি। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তোকে।

রংকিনীর মুখ, ফেলে-আসা ছেলেবেলার কথা মনে হওয়াতে এক আশ্চর্য সুন্দর হাসির আভাসে আভাসিত হল, বাইরের এই সুন্দর সামুদ্রিক সন্ধের বিধুর অনুপম আলোরই মতো।

রংকিনী বলল, মনে নেই আবার!

"বেলা যে চলে যায় ডুবিল রবি

ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী"।

আর তুই হয়েছিলি লীলা। তোকেও দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে, মোদের বকুল গাছে/রাশি রাশি হাসির মতো ফুল কত ফুটেছে/কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়/ও ভাই সাবধানেতে আর রে হেথা দিস নে দলে পায়"

ওরা দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। বহুদিনের পুরনো কথা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রংকিনী বলল, মনে আছে চুমকি, তোর শাড়ি খুলে গেছিল স্টেজে।

খুব জোরে হেসে উঠল রংকি।

বলল, মনে আবার নেই। মিস চ্যাটার্জি যা বকেছিলেন না! কান্নার চোটে আমার মেক-আপই গলে গেছিল।

সত্যি! ছেলেবেলার দিনগুলো যে কী ভাল ছিল, তাই না?

'মেয়েবেলা' বল। বলল, রংকিনী। তসলিমা নাসরিন কয়েন করেছেন শব্দটা।

তাই?

যে দিনগুলো চলে যায় সেগুলোই সুন্দর। প্রতিদিনই আজকের চৌকাঠে পৌঁছে মনে হয় গতকালটি কী চমৎকার কেটেছিল।

তা ঠিক।

জানিস ত? মিস চ্যাটার্জির বড় মেয়ে রিমির ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে।

ইস! তাই? বেচারী! এবং সে কারণেই যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছিল তার পরিবার বিয়ে ভেঙে দেন। ডানদিকের বুক কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

কী বাজে ব্যাপার। পুরুষগুলো আমাদের কি মনে করে বলত? আমরা কি দুধেল গাই? একটি বুক কাটা গেছে বলে ঐ বয়সের মিষ্টি মেয়েটিও বধূ হিসেবে গ্রহণীয় নয়? আনথিংকেবল।

তারপরই বলল, গাইবি না একটা গান? তুই কিন্তু খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতিস। রিয়্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত। আজকাল অনেক গায়িকা বাজারে ক্যান্টার করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে যে চিল-চিৎকারের অমিল আছে, গলা ভাল হলেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া যায় না, এ কথাটাই তাঁরা বোঝেন না। সেদিন দীপালি নাগ বাংলা অ্যাকাডেমির একটা সেমিনারে বলছিলেন "আজকাল চিৎকার করাটাই রেওয়াজ কিন্তু আগেকার দিনে বড় বড় মহিলা গাইয়েরা অনেকেই 'G' Scale-এ গাইতেন।"

তাই?

হ্যাঁ রে।

এই সব হাস্যময়ী-লাস্যময়ীরা ত শুধু আধুনিক গান গাইলেই পারেন। নয় তো যাত্রাতেও চলে যেতে পারেন স্বচ্ছন্দে। বছরে কুড়ি-পঁচিশ লাখ রোজগার করবেন অনেকেই। এইসব নব্যযুগের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েরা, কী পুরুষ, কী নারী, এক বছরেই যা রোজগার করছেন তা সারা জীবনেও সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, জর্জ বিশ্বাস বা সুবিনয় রায়রা করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীত এদের কাছে নিছকই টাকা রোজগারের মেশিন। নিষ্ঠা, নিবেদন, শ্রদ্ধা কিছুই নেই।

Bad money drives away good money, বুঝলি না! এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইকনমিক্স-এর সেই GRESHAM সাহেবের MAXIM-ই লাগু হয়েছে। ঐ সব গাইয়েদের মধ্যে অনেকের আবার ধারণা শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যাঁরা আজীবন সাধনা করলেন তাঁরা না কি ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছেন নতুনদের রোজগার দেখে।

বাংলাভাষাতে "অনুকম্পা" বলে যে একটা শব্দ আছে তা বোধহয় এই নয়া-জমানার সর্ববিদ্যা পারঙ্গম গায়িকারা জানেন না।

শুধু গায়িকাই কেন? তেমন তেমন লাঠি-ঘোরানো রঘু ডাকাতের মতন গায়কও কি এসে উপস্থিত হননি রঙ্গমঞ্চে? দাড়িওয়ালা গায়ক, গোঁফওয়ালা গায়ক, দাড়ি-গোঁফওয়ালা গায়ক। সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অথরিটি। তাঁরা সব নতুন 'টার্গেট-অডিয়েন্স" খুঁজে বেড়াচ্ছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তরীক্ষ থেকে তাঁদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন, অ্যাড-এজেন্সিরই মতন, তাঁর গানের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে। আসলে 'জনগণ' বলতে রাজনীতির মানুষেরা যা বোঝেন, ঐসব গায়ক-গায়িকারা যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্যে তাঁর গান কোনওদিনও বাঁধেননি। এই ইললিটারেটদের ডেমোক্র্যাসিতে প্রথমদিন থেকেই অশিক্ষিতরা এবং তাদের নিরন্তর ভোগলা-দেওয়া নেতারাই সর্ব-নিয়ন্তা হয়েছেন। Opinion of the masses। Opinion of the Quantitative মাসেস, অ্যান্ড নট দ্যাট অফ দ্যা Qualitative ফিউই ম্যাটার করে।

এইসব গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনই ভূতগ্রস্থ দৃঢ়মতি, এবং নিজের বিশ্বাসে এমনই অনড় যে, বলছেন, "যতদিন আমাকে ইট মেরে উঠিয়ে না-দেওয়া হচ্ছে ততদিন আমি গিটারের সঙ্গে এমন বিকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতই গেয়ে যাব।" তেমন তেমন গাইয়ের আবার তাবড় তাবড় রাজনৈতিক এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকও জুটে গেছেন। তাঁরা UNANIMOUS RESOLUTION নিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পিণ্ডি না-চটকে তাঁরা আদৌ ক্ষান্ত হবেন না। "বড়লোকের সখ" হিসেবে পৃষ্ঠপোষণ মন্দ সখ বলে গণ্য নয় কিন্তু পোষণ করার আগে পিঠটাকেও বাজিয়ে নেবেন না তাঁরা? সেটা কাছিমের পিঠ? না জেলিফিশের পিঠ তা তো দেখবেন।

এইসব গায়ক হয়তো জানেনই না যে প্রকৃতই যারা রবীন্দ্রানুরাগী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন তাঁরা ইট মারার দলে কোনওদিনও ছিলেন না। থাকবেনও না। অমন "ইট-মারা সংস্কৃতির" মানুষেরাই ওঁদের গান শুনতে আসেন। এবং আসবেন। তবে, কী আর করা যাবে? যাঁবা দলে আছেন, তাঁরাই আজ লাভবান। ILLITERATE MAJORITYকে তাঁদেরই মতো কিছু অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরাই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। যে কোনও TRADITION-ই গড়ে তুলতে লাগে বহুদিন কিন্তু তা ভাঙতে লাগে সামান্যক্ষণ। যাঁদের Conserve করার কিছু থাকে তারাই তো Conservative হন। অথচ এই বক্রগতি স্বার্থান্ধ মানুষদের মতেই তো রাজ্য চলছে। দেশ চলছে, স্থির পায়ে এগিয়ে চলেছে পরম সাংস্কৃতিক, সাংগীতিক, এবং সাহিত্যিক সর্বনাশের দিকে। তাতেও কি সাধ মেটেনি তাঁদের? বেচারী "বুর্জোয়া" রবীন্দ্রনাথকে কি ছেড়ে দেওয়া যেত না? এতদিন পরিত্যাজ্য হয়েই তো বেশ ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে RESSURECT করে এতো হল্লা-গুল্লা কিসের?

তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু এটাও ঠিক যে-সব পুরুষ ও মহিলা শিল্পী শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, তাঁদের মধ্যেও প্রচুর আতা-ক্যালানে ও ফসস্ আছেন। তাঁরা অশিক্ষিতও বটেন।

"আতা-ক্যালানে", 'ভোগলা', 'ফসস্' এইসব বিচ্ছিরী শব্দ কোথা থেকে শিখলি রে তুই? তোর মুখে এসব্ বেমানান লাগে।

সবই শিখেছিলাম চামেলীর কাছে। ভাষাতে যত নতুন শব্দ যোগ হয় ততই তো ভাষার 'যোশ' বাড়ে। হলই বা তা স্ল্যাং।

'যোশ'ও কি বাংলা?

না। কিন্তু অন্য ভাষার শব্দ নিতেই বা বাধাটা কোথায়?

রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা গাইবেন তাঁদের রবীন্দ্রপ্রভাবিত হতে হবে যে, এটা মানি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ পড়তে হবে, সেই "পূর্ণ মানুষ"টিকে জানার আন্তরিক আগ্রহ থাকতে হবে। তা না হলে, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিছকই "স্বরলিপি পঠন" হবে নয়ত নিছক "ঢঙ" বা তথাকথিত "রাবীন্দ্রিক ন্যাকামি।" এই ন্যাকামির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু কখনওই ছিলেন না।

আসল কথাটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে যে বা যাঁরা ভাল করে না পড়েছেন, তাঁর রুচিতে আবিষ্ট না হয়েছেন, তাঁদের জন্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত কখনওই নয়। শিক্ষার সঙ্গে, সাহিত্যমনস্কতার সঙ্গে, সুরুচির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত জড়িয়ে গেছে।

তোর গলা আর গায়নভঙ্গি কিন্তু এখনও চমৎকারই আছে। গান ছাড়লি কেন?

ছাড়িনি ঠিক। এখনও শরীর ভাল থাকলে এবং মনে খুশি থাকলে চানঘরে গাই। শুধু গানই নয়, অনেক স্বপ্নই এখন শুধু চানঘরে বেঁচে আছে। আমি যেদিন নিজের বাড়ি বানাব সেদিন আমার বাড়ির মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে বাগান আর বাকি এক তৃতীয়াংশর এক তৃতীয়াংশ হবে চানঘর। শিসমহলের মতন। নিচ থেকে আধ মিটার ছেড়ে চারদিকের দেওয়াল তিন মিটার মোড়া থাকবে আয়না দিয়ে।

বাঃ দারুণ আইডিয়া তো। কিন্তু অমন চানঘরে একা চান করতে কি ভাল লাগবে?

বোকাই তুই এক নম্বরের। দোকা হয়ে গেলে কি আর রোম্যান্স থাকবে অত? থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। একা বলেই তো এত স্বপ্ন!

গান গাস না, তবু কী ভালই গাইলি!

জানিস, যে রাতে গানটা শুনলাম, সারারাত পূরবী যেন মূর্ছনা তুলেছে আমার কানে অস্ফুট স্বপ্নের মধ্যে।

সত্যি, ভাব ব্যাপারটাই আজকাল অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার গলাতে দেখি না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ছেড়েই দিলাম। যাঁরা সাহিত্যই পড়েন না তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবেন কী করে!

কখন যে বেলা পড়ে গেছে, আলো নিভে গেছে, সমুদ্রের জল কালো হয়ে গেছে। সামনের পাহাড়ের ডান প্রান্তে লাইটহাউসটার আলো জ্বলে উঠেছে। আলোটা ঘুরছে চক্রাকারে।

আজ বোধহয় শুক্লা পঞ্চমী, চাঁদ উঠেছে কিন্তু একফালি। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি

খেলছে। ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় লক্ষ লক্ষ রুপোলি আলোর সাপ নিয়ে খেলা করছে কোন অদৃশ্য অমোঘ সাপুড়ে।

এমনই হয়। স্কুলের দুই বন্ধুর যদি অনেকদিন পরে দেখা হয়. তাদের আর্থিক, সামাজিক, মানসিক স্থিতি যদি প্রায় একই তল-এর হয়, তবে গল্প আর শেষ হতে চায় না।

চামেলীর খবর কি রে? যোগাযোগ কি আছে?

চামেলী হাওড়ার বাঁটরা না কোথায় থাকত। পদবী ছিল কুণ্ডু। ওর ঢালাইওয়ালা-ফিলদি-রিচ হোঁদল-কুৎকুৎ বাবার নাম ছিল ধ্বজা কুণ্ডু। ক্লাস টেনে পড়তে পড়তেই ওদের পাড়ার একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর সঙ্গে ও বাড়ি ছেড়েছিল। মনে আছে? খুব ওরিজিনাল এবং প্রবল নিজস্বতার অধিকারী ছিল কিন্তু চামেলী। চোয়াড়ে চেহারা ছিল ছেলেটির। ইন্টারমিডিয়েট ফেল। কালো। মাথাভর্তি চুল। লম্বা-চওড়া। আর ঘোর ক্যাবলা।

ঘোর ক্যাবলাটা আবার কি জিনিস?

ওমা। ক্যাবলার ক্লাসিফিকেশান নেই? ঘোর ক্যাবলা, ঘনঘোর ক্যাবলা, হোপলেস ক্যাবলা, আরও কত রকম আছে।

তাই?

নামও ছিল ভ্যাবলা।

এখন শুনেছি, ব্যবসা করে খুবই বড়লোক হয়েছে।

তা 'আতা-ক্যালানে' বলত কাকে চামেলী? আমার তো মনে পড়ছে না।

আরে 'আতা-ক্যালানে' বলত ওদের পাড়ার একগাদা-ফর্সা, ঘাড়ে-পাউডার দেওয়া, রাজেশ খান্নাকে নকল-করা লক্কা পায়রা ঢালাইওয়ালা, তেলকলওয়ালা, চালকলওয়ালা, পয়সাওয়ালাদের সব ছেলেদের, যারা ওকে বিচ্ছিরি হাতের লেখা এবং ভুল বাংলাতে 'লব-লেটার' লিখত।

আবারও জোরে হেসে উঠল রংকিনী।

বলল, সত্যি! তোর মনেও থাকে কিছু চুমকি!

ওরা দুজনে গল্পে মশগুল ছিল এমন সময়ে হঠাৎ দেখল একটা প্রকাণ্ড বড় এবং সাদা রঙা আলো-ঝলমল জাহাজ লাইটহাউসটা যে পাহাড়ে আছে তার ওপাশ থেকে এসে নিঃশব্দে মোড় নিল। মনেই হচ্ছে না চলছে বলে, এত আস্তে আসছিল জাহাজটা। সম্ভবত জাহাজ যত বড় হয় ততই আস্তে চলছে বলে মনে হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলে কি হয়, এমনই তার জোর যে চতুর্দিকের সমুদ্রজলে এবং দ্বীপে-দ্বীপে তার অনুরণন উঠল। BAR থেকে বারম্যান-এর এক অ্যাসিস্ট্যান্ট দৌড়ে এসে ড্রইং রুম-এর কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়াল।

বলল, হর্ষবর্ধন।

ওরাও দেখছিল। এই তাহলে কলকাতা থেকে সমুদ্রর মধ্যে দিয়ে আসা যাত্রী-জাহাজ হর্ষবর্ধন!

শি গুড হ্যাভ কাম ও উইক ব্যাক। দেয়ার ওজ সাম ট্র্যাবল অ্যাট দ্যা ক্যালকাটা পোর্ট। বারম্যান বলল।

হোয়াট ট্রাব্‌ল?

স্ট্রাইক অর বন্‌ধ, গো-স্লো অর সামথিং লাইক দ্যাট। টুমরো উ্য উইল গেট বিয়ার ফর ইউর শ্যান্ডি।

ওরা বিকেলে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরে আসার পর লেমনেডের সঙ্গে বিয়ার মিশিয়ে শ্যান্ডি করে খাবে ভেবে বারম্যানের কাছে চুমকি বিয়ারের খোঁজ করছিল। বারম্যান বলেছিল, আমাদের বিয়ার হর্ষবর্ধনে আসছে। জাহাজ এলেই দেব।

বারম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছিল, কলকাতা থেকে যে সব জাহাজ আসে সব এই দিক দিয়েই আসে আর চেন্নাই থেকে যেসব জাহাজ আসে তারা বন্দরের অন্য পাশ দিয়ে আসে। হোটেল থেকে দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে সাদা এবং আলোকিত হর্ষবর্ধন বাঁ-দিকের বাঁকে মিলিয়ে গিয়ে পোর্ট-ব্লেয়ার পোর্ট-এর দিকে এগিয়ে গেল। নোঙর করবে বলে।

জাহাজের বা অ্যারোপ্লেনের বাঁ-দিকটাকে বলে পোর্ট-সাইড —পোর্টের বা জেটির দিকে থাকে বলে। চুমকি বলল।

আর ডানদিকটাকে বলে স্টারবোর্ড সাইড। জানি আমি।

তুই জানিস। অনেকেই জানে না। চুমকি বলল।

কটা বাজে রে? রংকিনী বলল।

চুমকি তার রেডিয়াম-দেওয়া হাত ঘড়ি দেখে বলল, দেখেছিস। মাই গুডনেস! কটা বাজে বলত?

কটা?

নটা।

বলিস কিরে। ঈস্‌স। কী করে সময় যায়।

কী করে জীবন যায়!

চল খাই গিয়ে।

বলে, দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরের ডাইনিং হল-এ উঠে গেল। ডাইনিং হলটাও নামেই 'হল'। আসলে একটি খোলা বারান্দা। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া থাকলে অবশ্য ভিতরে বসে খাওয়ার জন্যে এয়ার-কন্ডিশানড ঘরও আছে। তবে এখন ডিসেম্বর মাস। বর্ষার বৃষ্টি নেই বটে কিন্তু বৃষ্টি আসে, যখন তখন। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দুশো পঁয়ষট্টি দিনই বৃষ্টি। রংকিনী ভাবছিল, ভরা শ্রাবণে এখানে একবার এসে শ্রাবণের রূপ উপভোগ করবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

সেট-মেনু কিন্তু অনেক অলটারনেটিভ আছে। ওরা দুজনেই প্রণ-ককটেইলস নিল। সুরমেই মাছ ভাজা। সঙ্গে টার্টার সস। তারপরে কাঁকড়ার একটি পদ। অবশেষে ফ্রুট স্যালাড উইথ চকোলেট আইসক্রিম।

চুমকি বলল, আমি তো আর দুদিন পরেই ভাগলবা। কিন্তু এইরকম ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুন টি আর ডিনার খেলে তোকে প্লেন থেকে ক্রেনে করে নামাতে হবে দমদম-এ পনেরো দিন পরে।

যা বলেছিস!

লাইটহাউসের তীব্র তীক্ষ্ণ আলোটা চক্রাকারে ঘুরছে। নির্ভুলভাবে বাতিঘরের আলোর রশ্মি ফিরে আসছে একই জায়গাতে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে। আলোটা বোধহয় ঠিক করেছে এ দ্বীপের কোনও রহস্যকেই আর রহস্য রাখবে না। অন্ধকারে থাকবে না কোনও কিছুই। গোপনও থাকবে না। সবকিছুকেই উন্মোচিত করবে এ। ওদের দুজনের লাগোয়া শোবার ঘরেও নিশ্চয়ই সারারাত এই আলো কী যেন খুঁজবে আঁতিপাতি করে।

ভাবছিল, রংকিনী।

বড় হওয়ার পর থেকে কখনওই অন্য কারো সঙ্গে, এমনকি কোনও নারীর সঙ্গেও শোয়নি বংকিনী। একা শোওয়ার অভ্যেসেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। পুরোপুরি। ভবিষ্যতে কোনওদিন যদি অন্য কারো সঙ্গে, বিশেষ করে কোনও পুরুষের সঙ্গে এক খাটে শুতে হয়, তবে বোধহয় ঘুমই আসবে না। নিজের নিভৃতি, গোপনীয়তা, নিতান্ত সব অতি ব্যক্তিগত দুর্মর অভ্যেস কী করে বাঁধা দেয় দম্পতিরা একে অন্যের কাছে নিঃশর্তে, কে জানে তা! কী এমন থাকে দাম্পত্যে? শুধু দম্পতিরাই জানে হয়ত।

ভাবলেও অবাক লাগে ওর।

চুমকি বলল, কাল ভোরে বেরিয়ে জলিবয় আইল্যান্ড, পরশু লাঞ্চ এর পরে আবাবও চিড়িয়া টাপ্পু, সকালে মিউজিয়াম, অ্যাকোরিয়াম, চিড়িয়াখানা এসব দেখে তারপর দিন "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ যাব।

কোথায়?

আমার দ্বীপে।

দ্বীপের নাম "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"? বলিস কি?

হ্যাঁরে। কোন পাগলা সাহেব বা জলদস্যু নাম দিয়েছিল কবে তা কি করে বলব? ঠাকুমা যখন দ্বীপটি কেনেন তখন তার এ নামই ছিল।

অবাক করলি তুই!

আমাকে কিন্তু সেদিনই বেলাবেলি ফিরে আসতে হবে পরদিন সকালে প্লেন ধরার জন্যে। এই তিনদিনও তোর জন্যেই বেশি থাকতে হল আমায় এইখানে। ভাগ্যিস সকালে এসেই এস টি ডি-তে অফিসকে পেয়ে গেলাম এবং শনি-রবির সঙ্গে "বন্‌ধ"ও পেয়ে গেলাম। নইলে ...।

আমি চলে গেলে তুই এখানে কি করবি একা একা?

ঘুমাব। কত ঘুম যে জমেছে কী বলব তোকে। ঘুমাব, খাব আর বই পড়ব। অনেক এনেছি সঙ্গে। কিনেছি সেই কবে কিন্তু পড়ার সময় পেলাম কোথায়? এখানে পড়ব।

ভাল।

"বন্ধ"-এর কথা আর বলিস না। যখন তখন পশ্চিমবঙ্গের এই 'বনধ'-এর কালচার এর জন্যে সারা পৃথিবীতে তো বটেই পুরো দেশেও লজ্জাতে মুখ দেখানো যায় না। মাসে কদিন কাজ হয় বলত?

সত্যি! এই এক রীতি হয়েছে আজকাল সব দলের। যারাই "বন্ধ" ডাকে তারাই হয় শুক্রবারে ডাকে, নয় সোমবারে। সকলেই বুঝে গেছে আমরা কাজ ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছুই চাই না। শান্তিনিকেতন, দীঘা, পুরী, বকখালি, বিষ্ণুপুর, গালুডি, গাদিয়ারায় বেড়িয়ে আসার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কি পাওয়া যায়? নিদেনপক্ষে শালী-ভায়রাভাই-এর বাড়ি নয় তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাটাবার এমন WINDFALL সুযোগ!

এখন রাজনীতি বলতে আর রাজ্যর ভাল বোঝায় না, পার্টিদের ভালই বোঝায়। বড় দুঃখের কথা।

রংকিনী বলল।

সত্যি! কাজ না করলে কোনও রাজ্যেরই কোনওরকম উন্নতিই কি হয়?

ওরা খেয়েদেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে যখন তখন এক বয়স্কা বাঙালি মহিলা সিঁড়ির সামনের টেবল থেকে বললেন, ওমা! চুমকি না?

চুমকি দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণ ভাল করে দেখে বলল, ও-ও-ও। ভাল আছেন?

হ্যাঁ। ভাল আছি।

তোমার স্বামী কোথায়? সঙ্গে এই মেয়েটি কে?

ও আমার বন্ধু।

আর স্বামী? এখনও বিয়ে হয়নি? এতো বয়স হয়ে গেল।

চুমকি শক্ত গলাতে সামান্য অভব্যতার সুর লাগিয়ে বলল, বিয়ে "হয়নি" বলবেন না, বলুন বিয়ে "করিনি"। আজকালকার শিক্ষিত, সচ্ছল, স্বাবলম্বী অধিকাংশ মেয়েদেরই বিয়ে "হয় না"। তারা নিজেরা ইচ্ছে করলে এবং তাদের পছন্দসই সেরকম রূপে-গুণে-যোগ্য পাত্র পেলেই তারা দয়া করে সেই পাত্রকে বিয়ে করে।

তারপর বলল, আমিও বিয়ে করিনি, আমার বন্ধুও নয়।

ভদ্রমহিলার সম্ভবত তাঁর স্বামী অথবা সঙ্গীর সঙ্গে চুমকির আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু চুমকি সে সুযোগই দিল না।

তবু গায়ে-পড়া ভদ্রমহিলা বললেন, উঠেছ কোথায়? আমরা উঠেছি সিনক্রেয়ারস-এ। এখানে ডিনার করতে এসেছিলাম।

আমরা এই হোটেলেই উঠেছি।

চুমকি বলল।

বাবাঃ এতো সবচেয়ে এক্সপেনসিভ হোটেল।

হ্যাঁ। আমরা কিন্তু বাবা বা স্বামীর পয়সাতে এখানে এসে উঠিনি। নিজেদের টাকাতেই

বলেই, রংকিনীর হাত ধরে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

রংকিনী ফিসফিস করে বলল, অমন অভদ্র ব্যবহার করলি কেন রে? ভদ্রমহিলা কে?

"ভদ্রমহিলা" কি না জানি না। উনিই হচ্ছেন রূপকড়ার মাসি। সঙ্গের ভদ্রলোক ওঁর স্বামীর ম্যানেজার ছিলেন। ওঁর সঙ্গেই এর অ্যাফেয়ার। স্বামীকে নাকি দুজনে মিলে বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি।

তারপরই বলল, কেন? খারাপ কি বলেছি? যার যেমন ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা তার সঙ্গে সেবকম ব্যবহারই তো করা উচিত।

তাহলেও, তুই বড় রুক্ষ হয়ে গেছিস চুমকি।

চুমকি বলল, হয়ত হয়েছি। জীবনই করেছে। আমি তো গরিব বাবার অরক্ষণীয়া কন্যা নই। বহুযুগ ধরে সমাজ যে অপমান এদেশের মেয়েদের করেছে আমি সে অপমানের শোধ তুলি সুযোগ পেলেই। 'শি ইজ আ হোর।' এর চেয়ে ভাল ব্যবহার পাবার যোগ্যতা তো ওঁর নেই।

৫

এখনও অন্ধকার আছে। তবে পুবের আকাশ এতক্ষণে চাল-ধোওয়া সাদা রঙে আভাসিত হয়ে যেত, যদি না মেঘ থাকত আকাশে।

চুমকির পরিচিত এক ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সাদা-রঙা একটি কেবিনওয়ালা বোট-এ করে ওরা বেরিয়ে পড়েছে পোর্ট ব্লেয়ার-এর জেটি থেকে "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট" আইল্যান্ড-এর উদ্দেশে। বোটটার নাম "ওঙ্গে"।

যেহেতু সেই পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে আহুক বোস একাই থাকেন, তাই ওরা কিছু ফল, পাঁউরুটি, মাখন, চিজ এবং স্যুপ-এর প্যাকেট নিয়েছে সঙ্গে।

চালিয়াতি বলতে চুমকির একটাই চালিয়াতি আছে, দার্জিলিং-এর চা ছাড়া খেতে পারে না। তাই চা-এর প্যাকেটও নিয়েছে একটা। কনডেনস্‌ড মিল্কও।

হু-হু করে জোলো-বাতাস লাগছিল চোখেমুখে। বোটটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে। সারেং ছাড়া আরও দুজন সাহায্যকারী আছে। চারধারে কালো জল। আলো নেই বলে কালো নয়, এমনিতেই কালো।

এইজন্যেই কি আন্দামানে যখন বন্দিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হতো তখন বলা হতো কালাপানির দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হল?

রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

তা জানি না। কিন্তু সত্যিই এখানের সমুদ্রের জল কালো।

কেন রে?

সব জায়গায় কি আর কালো! যেখানে জল খুব গভীর সেখানেই কালো দেখায় হয়ত।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বীপেই কিন্তু তটভূমি বলতে যা বোঝায় তা নেই। গভীর নিথর সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে পাহাড় উঠেছে আর সেই পাহাড়গুলোই দ্বীপ। লক্ষ করেছিস, এই সব পাহাড়ে পাথর বিশেষ নেই কিন্তু। গভীর জঙ্গল, নানা রকমের আদিম গাছ, লতা, গুল্ম। মানুষের লাগানো নারকোল গাছ। এখানে নারকোল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

লক্ষ্য করেছিস? সব দ্বীপের মাটিই লাল। সিঁদুর রঙা।

সব জায়গাতেই যে সিঁদুররঙা তা নয়। গেরুয়া লাল, ভগুয়া লাল, লামা লাল।

ঠিক বলেছিস। পাথর আছে স্যেশেলস-এর দ্বীপগুলোতে। গ্রানাইটের দ্বীপ সবই। বেশিই কালো, কিছু সাদা। চাঁদনী রাতে বা অন্ধকারেও গা-ছমছম করে সেইসব দ্বীপে

চাইলে, এমন সব কিম্ভূত-কিমাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় চারদিকে। কিন্তু অমন সব সুন্দব সমুদ্রতট পৃথিবীর মধ্যে খুব কম জায়গাতেই আছে। আর প্রবালের কী বাহার! এখানের জলিবয় আইল্যান্ডে দেখলি তো প্রবাল। হলদেটে, ছাইরঙা এবং সবুজাভ। সিন্‌ক আইল্যান্ডসেও আছে। আর ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের প্রবালদের যে কত রকমের রঙ। ফিরোজা, লাল, নীল, সবুজ, ফিকে হলুদ। সত্যিই মনে হয় কোনও স্বপ্নের দেশেই এসেছি। আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি, বুঝলি রংকি, যে বিয়ে যদি কখনওই করি, তবে স্যেশেলস-এই যাব হানিমুন করতে।

যদি!

রংকিনী বলল, ছোট্ট করে।

ইয়েস। যদি। আর তুই কোথায় যাবি? হানিমুনে?

চুমকি বলল।

যদি যায় নদীতে।

বল না। ইয়ার্কি কেন করছিস।

হানিমুনে হানি নেই, মানিব্যাগে মানি। কবে বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে, তার ঠিক নেই, তার হানিমুন। ছাড় এসব কষ্টকল্পনা। পাগলের প্রলাপ যত্ত।

তারপরে বলল, আমার মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে এবাবে সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এ যেতে পারলাম না বলে। নামটা অদ্ভুত ত! তোর "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এরই মতো। "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট" নিশ্চয়ই ইংরেজ নাবিকদের দেওয়া নাম। ভয় পাবার মতো এই দ্বীপে অবশ্যই কিছু ছিল। নইলে কি মিছিমিছি এই নাম দেয় ইংরেজ জলদস্যুরা? ওরা কথাতে বলে না—"TO STIR A HORNEST'S NEST."

ঠিক।

সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এর নাম দিয়েছিল ফরাসি নাবিকেরা। ফরাসিতে সিন্‌ক মানে হচ্ছে পাঁচ।

বানান কী?

CINQUE। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ছাব্বিশ কির্মি। ওয়ান্ডুর থেকেও যাওয়া যায়। সিন্‌ক আইল্যান্ডসও ম্যারিন স্যাংচুয়ারি। কী সুন্দর যে সব প্রবাল আছে। প্রবাল প্রাচীর। কত রকমের মাছ, কত রঙা শ্যাওলা, অ্যালগি, ফাঙ্গি, প্ল্যাংকটন। যখন ভাঁটি দেয়, তখন এক দ্বীপ থেকে অন্য চারটি দ্বীপেই স্বচ্ছ জল পেরিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কী যে সুন্দর, তা তুই নিজে না গেলে বিশ্বাস করবি না। তবে নিজেদের বোট ভাড়া করে গেলেই ভাল। ভাঁটা তো আর বেশিক্ষণ থাকে না! জল বাড়বার আগেই উঠে আসতে হয় জল ছেড়ে। অবশ্য তখন সাঁতার কাটে অনেকেই, স্নরকেলিংও করে। রাবারের 'স্নরকেল' ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে অক্সিজেন সিলিন্ডার নইলে স্কুবা-ডাইভিং করা যায় না। জলি বয় আইল্যান্ডে যেমন দেখলি লেখা আছে "Leave only your foot prints behind." সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এও তেমনই লেখা আছে। কোনও জিনিসই ঐ

সব দ্বীপে ফেলে আসার নিয়ম নেই, সে স্যান্ডউইচের বাক্সই হোক কী সিগারেটের প্যাকেট কী কোকা-কোলা বা বিয়ারের টিন।

এই সুঅভ্যেস তো সব জায়গাতেই বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কি বলিস তুই!

তা তো বটেই। বিশেষ করে আমাদের, মানে ভারতীয়দের। যাদের অধিকাংশ অভ্যাসই 'কু'। যত সুন্দর জায়গাতেই যাক না কেন, খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে জায়গাটাকে নোংরা করাই আমাদের চরিত্র। অন্য কেউ যে সেখানে আসবে আমাদের পরে সেকথা আমরা ভাবিই না। স্বার্থপরতার চরম একেবারে।

আমার কিন্তু চিড়িয়া-টাপ্পু বেশ লেগেছে। যাওয়ার পথটিই ভারি সুন্দর। কী বিশাল বিশাল মহীরূহ দু'পাশে। পুরো পথটাই পাহাড়ী। আবার মাঝে মাঝে সমুদ্র এসে পথ-পাশে একেকবার সুন্দর মুখ দেখিয়েই লুকিয়ে পড়ছে। উল্টোদিকে আবার নদী, ব্যাকওয়াটার। আশ্চর্য প্রকৃতি কিন্তু এখানের। এমনটি অন্য কোথাওই দেখিনি।

তাই?

হ্যাঁ। তোকে বলেওছিলাম আগে।

টাপ্পু মানে কি রে? রংকিনী বলল।

টাপ্পু মানে পাহাড়। আন্দামানী ভাষায়। চিড়িয়া-টাপ্পু মানে পাখি-পাহাড় বলতে পারিস। চিত্ত দে নামের এক পাগল ভদ্রলোক অযোধ্যা পাহাড়ে অগণ্য পাখি খোদাই করছেন দল-বল নিয়ে। তারও নাম দিয়েছেন পাখি-পাহাড়।

অযোধ্যা পাহাড় মানে? যে অযোধ্যাতে বাবরি মসজিদ?

চুমকি হেসে বলল, আরে না রে না। আমাদের পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। ভারতবর্ষ দেশটা এতই বড় যে একই নামের জায়গা তুই সারা ভারত খুঁজলে হাজারটা করে পাবি। ইউনাইটেড স্টেটসও সেরকম। সে তো ভারতের চেয়েও বহুগুণ বড়।

বাবাঃ। চিড়িয়া-টাপ্পুতে কী আদিম সব রেইন ফরেস্টস! কত বিচিত্র তাদের রঙ। কতরকম লতা-পাতা। নিশ্ছিদ্র জঙ্গল। দিনমানেও আলো ঢোকে না ভিতরে। গা-ছমছম করে। তাই না?

কিন্তু যাই বলিস, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোনও মাংসাষী শ্বাপদ নেই বলেই ভয় নেই। আর যাই বলিস আর তাই বলিস, ভয় না থাকলে রহস্যও থাকে না। থাকে কি? বল? আমার তো মনে হয় না।

ভয় নেই বলছিস কেন? সাপ তো আছে অনেকই রকম। জলে আছে, ডাঙায় আছে। কেউটে, চন্দ্রবোড়া, নানা রঙা সব চিত্রবিচিত্র সাপ। আর তাদের ধরে খাবার জন্যে গা-ঘিনঘিন করা ঘন-ঘন জিভ বের-করা ইয়া বড় বড় গোসাপ।

যাই বলিস চুমকি, তোকে আমি ঈর্ষা করেছি, আজ স্বীকার করছি, ছেলেবেলা, থুড়ি মেয়েবেলা থেকেই নানা কারণে। কিন্তু তুই যে এমন জলের রানী, দ্বীপের রানী তা জানার পর থেকে তোর প্রতি ঈর্ষাটা এক লাফে অনেকই বেড়ে গেল। ভাবা যায়! একটা আস্ত দ্বীপের মালকিন তুই!

হলে কি হয়! কী সাংঘাতিক দ্বীপ তা তো জানিস না। এই দ্বীপে অনেক জাহাজডুবি নাবিক আর জলদস্যুদের আত্মা আছে। কত খুন-খারাপি হয়েছে একসময়ে। আফ্রিকা, বার্মা, মানে এখনকার মায়নামার এবং থাইল্যান্ডের কত মেয়েরা অত্যাচারিত হয়ে মরেছে একদিন এখানে। অনেকই প্রেতাত্মার বাস 'দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট'-এ।

ভাগ্।

ভাগ্ কি রে? তুই ভীরাপ্পানকে জিজ্ঞেস করিস। তাকে বলব আমি তোকে সেসব গল্প করতে, কোনও অন্ধকার রাতে। যদি কেউ এখানে কদিন থাকে তবে নিজেই কত সব শব্দ শুনবে রাতে। অন্যকে কিছুই বলতে হবে না। আলো-ঝলমল কলকাতাতে বসে যা সহজেই গাঁজা-গুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা এই সমুদ্র-ঘেরা নির্জন দ্বীপের আদিম অরণ্যের অন্ধকারে বসে করা যায় না।

আহা! রাতে গল্প শোনার জন্যে কে থাকবে এখানে? ফিরে তো আসব আমরা আজই দিনে দিনে।

তা কী করে বলব! যাওয়াটা তোমার হাতে অবশ্যই। ফেরাটা তো নয়! বোস সাহেব প্রায় ছ'বছর এই দ্বীপে ভীরাপ্পানের সঙ্গে একা রয়েছেন। মাঝে মাঝে মাতৃভক্ত ভীরাপ্পানও তো চলে যায় ওঁকে একেবারেই একা রেখে। মাসের মধ্যে একবার তো যায়ই। জানি না, আজও গিয়ে তাকে দেখতে পাব কি না।

তারপরে বলল, পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলে না থেকে "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এই থেকে যা-না বাকি কটা দিন। "এক্সপিরিয়েন্স অফ আ লাইফ টাইম" হবে। সারা জীবন মনে রাখতে পারবি এই কটা দিনের অবিস্মরণীয় দুর্মর স্মৃতি। এমন সুযোগ কি রোজ আসে কারো জীবনেই? বল তুই। "ইউ উইল বি দ্যা কুইন অফ অল উ্য সার্ভে"।

ভালই বলেছিস। রংকিনী বলল। দ্বীপের নাম "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"। আমার অচেনা একমাত্র দ্বীপবাসীর নাম আহুক বোস, ওরফে রবিনসন ক্রুসো। তাঁর ভ্যালের নাম ভীরাপ্পান, ওরফে ফ্রাইডে। এবং বলছিস যে সে দ্বীপে অনেক প্রেতাত্মাও বাস করে বিষাক্ত সাপ আর বিকটদর্শন গোসাপদের সঙ্গে। এই নইলে বন্ধু তুই!

তারপরে বলল, তোর এই ভীরাপ্পান কি চন্দনগাছ আর হাতির যম তালিমনাড়ু আর কর্নাটকের সেই কুখ্যাত ভীরাপ্পানের কাজিন-টাজিন হয় নাকি?

হলেই বা ক্ষতি কি? এই "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এর আশ্চর্য সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আদিম গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি, এর আশ্চর্য সুন্দর জনহীন তটভূমি, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় এই পৃথিবীতে নয়, অন্য কোথাওই পৌঁছে গেছি। আর তার উপরে আহুক বোস-এর মতন একজন পূর্ণ মানুষের সঙ্গ। তুই জানিস না, তুই কি হারাইতেছিস।

বলেই, হাসল চুমকি।

রংকিনীর মনে হল, ও ঠাট্টা করছে।

পূর্ণ মানুষ মানে? কি বলতে চাইছিস? বুড়ো? ঝুনো নারকেল?

ইডিয়ট। তুই কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ এত কপচাস আর রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণ মানুষের' কনসেপ্ট-এর কথাই জানিস না? পৃথিবীর সব মানুষেরই ঐরকম মানুষ হয়ে ওঠারই প্রার্থনা হওয়া উচিত।

ঐরকম মানে? কী রকম?

ঐরকম মানে "পূর্ণ মানুষ" হয়ে ওঠার প্রার্থনা।

তুই দিনে দিনে বড় গোলমেলে হয়ে উঠছিস। যাকে বলে, কমপ্লিকেটেড। তোর মিস্টার আহুক বোস একজন পূর্ণ মানুষ?

পূর্ণ পুরুষ। তাঁর সংস্পর্শে, তাঁর সঙ্গে থেকে, তুই-ও পূর্ণা হতে পারিস, পূর্ণা হতে পারে যে কোনও নারীই।

আমি ভাই রংকিনী আছি, পূর্ণা রংকিনীই থাকতে চাই। আমার পূর্ণতা অন্য কারো দয়ানির্ভর নয়। নিজে ভগ্নাংশ হয়ে থাকলেও আপত্তি নেই কোনও।

পূর্ণা হওয়াই তো প্রত্যেক নারীরই জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। স্বীকার করিস আর নাই করিস, ইচ্ছে কি করে না?

না। করে না। তা তুই নিজেঁ হলি না কেন? তুইই পূর্ণা হ! কে তোকে মানা করেছে? তোর দ্বীপ, তোর ম্যানেজার, তোকে ঠেকাচ্ছেটা কে? পরিপূর্ণা হয়ে ওঠ এখানে "পূর্ণ মানুষের" সঙ্গে থেকে। পরিপূর্ণ হয়ে উপচে যা। পৃথিবীর সব ART-এর জন্মই তো এই উপচে-যাওয়া থেকে, Supcifluity থেকে।

চুমকির মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বলল, "দ্যা হর্নেট্‌স নেস্ট" যে সকলকে গ্রহণ করে না প্রসন্ন মনে। যাদের করে না, তাদের প্রাণ বিপন্ন হয়।

নইলে, এখানে কি জলদস্যু আর জাহাজডুবি হওয়া মানুষদের অগণ্য বদ্ধ-আত্মা এমন হাঁড়ির মধ্যে শিঙি মাছের মতো খলবল করে!

রংকিনী বলল, কপট রাগের সঙ্গে।

বোকা-বোকা কথা বলিস না।

না রে! আমার ভীষণই ভূতের ভয়। আমি এই দ্বীপে সে জন্যেই একরাতও কাটাইনি।

চুমকি বলল।

আমার ভূতের ভয় নেই একটুও।

তাহলে তো ফারস্ট ক্লাস। থেকে যা। না থাকলে, উ্য উইল রিপেন্ট। সারা জীবন আপসোস করবি রংকি।

ভূতের ভয় না থাকলেও অন্য ভয় আছে আমার।

রংকিনী বলল।

কিসের ভয়? বোস সাহেবের? আহা! হি ইজ আ ফাইন জেন্টেলম্যান।

কী জানি। পুরুষদের মধ্যে জেন্টেলম্যান তো খুব বেশি দেখিনি এ পর্যন্ত। বিশ্বাস হয় না। তবে তোর বোস সাহেবকে ভয় পাওয়ার কি আছে? একজন সামান্য পুরুষই ত! তিনি পূর্ণই হন কি ভগ্নাংশ, আমার কোন ক্ষতি করতে পারেন? আই অ্যাম নট মেড অফ সাচ স্টাফ।

তিনি সামান্য আদৌ নন। তবু। ওঁকেই যদি না হয় ভয়, তাহলে তোর ভয় কাকে?

ভয় আমাকেই। আমি নিজেকে বড়ই ভয় পাই।

কী যে হেঁয়ালি করিস, তুই-ই জানিস।

আমি হেঁয়ালি করি না। আমি নিজেই হেঁয়ালি। তুইও হেঁয়ালি। হেঁয়ালি যে, তা তুই জানিস না হয়ত, এই যা। আমরা প্রত্যেক নারী ও পুরুষই একেকটি হেঁয়ালি বলেই তো এত ইন্টারেস্টিং। একথা কি তোর কখনও মনে হয়নি?

চুমকি জলের দিকে চেয়েছিল। সূর্যর আলোয় লক্ষ লক্ষ সোনালি সাপ কালো জলে কিলবিল করছিল দ্রুত ধাবমান বোটের দুপাশে। পেছনে বোট-এর প্রপেলর-মথিত সাদা ফেনা সেই সোনার সাপগুলোকে ইরেজার-এর মতো মুছে দিচ্ছিল অনুক্ষণ।

চুমকি রংকিনীর প্রশ্নর কোনও উত্তর দিল না। সে নিজেও যে হেঁযালি তা যেন এতদিনে বুঝতে পারল চুমকি। এবং বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

ততক্ষণে মেঘ একেবারেই সরে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠেছে। ওদের অলক উড়ছে হাওয়ায়, দু'কানের পাশে, যদিও টুপি পরে আছে ওরা দুজনেই। চুমকি পরেছে ফেডেড জিনস। হালকা নীল রঙা। আর ঊর্ধ্বাঙ্গে কমলা-রঙা গেঞ্জি। রংকিনী পরেছে জংলা কাজের ফিকে-সবুজ সালোয়ার-কামিজ। ওকে জংলা-রাগে বাঁধা ধীরা আলাপের বন্দীশ-এর মতো দেখাচ্ছে। মানুষ ভাবে, গান কি বাজনা বুঝি দেখা যায় না। যায় দেখা। ভাল লেখা বা ভাল ছবি যেমন শোনা যায়, ভাল গান-বাজনাও দেখা যায়।

আরও বেলা বাড়লে জংলা থেকে রামকেলি হয়ে যাবে জংলা কাজের সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা রংকিনী। তারও পরে, ভরদুপুরে, রাগ পটদীপ।

আর কতক্ষণ লাগবে রে? রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

হাত-ঘড়ি দেখে চুমকি বলল, ঘণ্টাখানেক তো হল। ধর, আরও ঘণ্টাখানেক। তবে আমাদের নিজেদের বোটে আসতে তিন ঘণ্টা লাগে। এই বোটটার গতি অনেক বেশি।

কোনওদিকেই কোনও ভূখণ্ড আর চোখে পড়ে না এখন। চার দিকেরই নীল দিগন্তে আকাশ নেমে এসে চুমু খাচ্ছে সবজে-কালো সমুদ্রকে, আর সমুদ্র-আকাশকে। কেমন যেন ভয় ভয় করে। মানুষ যে তার এত কিছু আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের পরও, চাঁদে পা দেবার পরেও, মঙ্গলগ্রহের ফোটো তোলার পরেও প্রকৃতির প্রেক্ষিতে এখনও পুরোপুরি অসহায়, এই কথাটাই এমন এমন সময়ে মনে আসে।

চুমকি গলাতে একটি সুন্দর ডিজাইনের রুপোর হার পরেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের জেটির পথে হোটেল থেকে গাড়িতে আসবার সময়ে সকালেই লক্ষ্য করেছিল

রংকিনী। তবে হারের লকেটটা দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎই নিজের গেঞ্জির মধ্যে ডান হাতের আঙুল ঢুকিয়ে লকেটটা টেনে বের করল। তখন রংকিনী দেখতে পেল যে, সেটা লকেট নয়, একটি কম্পাস।

দেখতে জানিস?

রংকিনী জিজ্ঞেস করল চুমকিকে কম্পাসটার দিকে চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

না কি, গয়না?

অবশ্যই জানি। এই কম্পাস তো যে কোনও বাচ্চাও দেখতে পারে। খুবই সোজা। তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি এখুনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু যে অদৃশ্য কম্পাস দেখতে জানলে কাজের মতো কাজ হতো তা তো দেখতে শিখিনি। আমিই শিখিনি তার তোকে কি করে শেখাব বল?

অদৃশ্য কম্পাসটা আবার কি জিনিস? এটা কি নকল নাকি?

না রে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গন্তব্য যে কম্পাস ঠিক করে দিতে পারে, শুধরে দিতে পারে ভুল পথের পথিককে, বাতলে দিতে পারে ঠিক পথের হদিস, সেই কম্পাস। জাহাজ বা এরোপ্লেন বা মরুভূমিতে বা জঙ্গলে পথ-হারানো যান বা মানুষকে পথ দেখাতে পারে এই কম্পাসটি সহজেই কিন্তু জীবনের গন্তব্যে, চাওয়া-পাওয়ায়, যে পদে পদে পথভ্রষ্ট হই আমরা, সেই পথের সঠিক হদিস যে কম্পাস দিতে পারে, তা কি আমরা কেউই দেখতে জানি?

এবার রংকিনী চুপ করে রইল। উত্তর দিল না চুমকির কথার।

বড় বেশি কথা বলেছে ওরা দুজনে আজ সকাল থেকে।

নৈঃশব্দের চেয়ে বড় শব্দ আর নেই, নীরবতার মতো বাঙ্ময় সম্ভবত আর কিছুই নেই। ওরা দুজনেই যেন এই অমোঘ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে দু'পাশ দিয়ে দ্রুত সরে-যাওয়া সমুদ্রের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ওদের সঙ্গে বোটটি এগিয়ে চলল অসীম জলরাশির উপর দিয়ে "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এর দিকে। বোটের ডিজেল এঞ্জিনের আরোহন-অবরোহন হীন এক স্কেলে বাঁধা স্বর, বোটের মুখের সঙ্গে জলের সংঘাতের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ, আর দু'পাশের দ্রুত সরে যাওয়া জলের সড়-সড় শব্দের একঘেয়েমিতে কেমন ঘুম ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল রংকিনীর।

৬
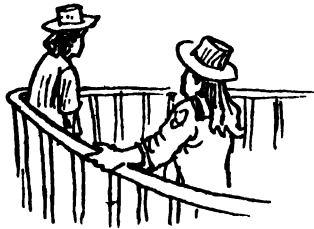
সকাল আটটাতে এসেছিল। এখন রাত আটটা। চুমকি চলে গেছে বিকেল চারটেতে। কাল সকালের প্লেন ধরবে কলকাতার। এরই মধ্যে রংকিনীর মনে হচ্ছে যেন কতদিন হল এই দ্বীপেই আছে।

কোথায় বে-আইল্যান্ড হোটেলের পাঁচ কোর্স-এর ডিনাব আর কোথায় এই খাওয়া।

রংকিনীর মনের কথাটি বুঝতে পেরেই যেন আহুক বোস বললেন রংকিনীকে, কী করবে? নিজেই যদি নিজেকে কষ্ট দাও তো তোমাকে বাঁচাবে কে?

কেন? মসুর ডালের খিচুড়ি কি খারাপ খাবার? তার সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু ভাজা, ডিমভাজা। আমার খুবই পছন্দের খাবার। তাছাড়া, আপনি রান্নাটাও যা করেছিলেন। অপূর্ব।

কাল তুমিই রান্না কোরো দুপুরে। আমার রান্না যে কী উপাদেয় তা তো আমি জানিই।

আমি? এই রে! রংকিনী বলল।

কেন?

আমি তো চা আর ওমলেট ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানি না।

বলো কি? সংসার যখন করবে তখন কি করবে?

রুটি-মাখন খাব। সংসার আমাকে চাইলে না আমি সংসার করব! এসব আর হবে না।

আহুক-এর মুখে এসে গেছিল, তোমার বয়স কত?

পরক্ষণেই সামলে নিলেন। মহিলাদের বয়স তো জিগ্যেস করা যায় না।

তারপর বললেন, সংসার করার সময় তো পড়ে আছে অঢেল। হবে না বলছ কেন?

সংসার-এর কনসেপ্টটাই তো বদলে গেছে। যদি তেমন একজন সচ্চরিত্র সাধারণ ভাল মানুষ পুরুষ পেতাম যে আমার সন্তানদের মানুষ করত, বাড়িঘর দেখত, ভাল রান্না করত চাকর-আয়া ম্যানেজ করত তবে বিয়ে করতাম।

ঈসস্। আগে জানলে তো আমিই তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম। আমি না হয় বাদই গেলাম কিন্তু তুমি সাধারণ, সচ্চরিত্র, ভালমানুষ পুরুষ একজনও কি পেলে না?

পুরুষদের মধ্যে সচ্চরিত্র খুঁজতে যাওয়া আর ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করা একই ব্যাপার।

কিন্তু চরিত্রহানি তো পুরুষ একা একা ঘটাতে পারে না। শুধু পুরুষদের দোষ দেওয়া কি ঠিক?

এই কথাতে, হেসে ফেলল রংকিনী।

যাকগে। তুমি যদি না রাঁধো তো আমার রান্না অখাদ্য-কুখাদ্যই খেতে হবে। কষ্ট হবে কিন্তু তোমার খুবই। ভীরাপ্পান এলে অবশ্য তোমাকে গরম-গরম দোসা এবং শুঁটকি মাছ খাওয়াতে পারবে।

শুঁটকি মাছ? মরে গেলেও খাব না।

তারপরে বলল, কী কষ্ট আর কী আনন্দ তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেকরকম। আপনি নিজেও খুব ভাল করেই জানেন যে, ভাল লাগবে যে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম বলেই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে আপনাব এই "হর্ণেট্স নেস্ট"-এ থেকে গেলাম। এখন ভীরাপ্পান আসার সময়ে যদি আমার স্যুটকেসটা নিয়ে আসে, তবেই বাঁচোয়া। আসবে তো? নইলে এই একটি সালোয়ার-কামিজ পরে তো থাকতে পারব না।

কিছু না পরে থাকলেই বা কি? এই দ্বীপে আকাশ আর সমুদ্র আর কিছু পাখি আর সাপ ছাড়া তোমাকে দেখার মতো আরও কেউই নেই।

কেন? আপনি?

আমি একটা অশক্ত বুড়ো। আমাকে কি তুমি মানুষ বলে গণ্য করবে নাকি! আমাকেও সাপ বা পাখির মতোই মনে কোরো। আর তা যদি মনে না করতে পারো, তবে না হয় তোমার দিকে চাইবই না। অথবা দুচোখ বেঁধে রেখো আমার।

ভীরাপ্পান যদি কাল না আসে তবে তাই হয়ত করতে হবে।

তাই কোরো। এখন চলো, বাইরে গিয়ে বসি। প্রকৃতির মধ্যে থাকবে বলেই তো, এতো কষ্ট কবতে হবে জেনেও রয়ে গেলে "হর্ণেট্স নেস্ট"-এ। ঘরের মধ্যে থেকে কী করবে?

এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে দিতে হবে না? চামচ-টামচ।

তোমার কিছুই করতে হবে না। তুমি অতিথি। ভারতীয় অতিথি। আমি তো আর সাহেব নই যে, অতিথিকে দিয়েও কাজ করাব। রোজই করি। করে নেব। যে কদিন আছ এখানে, তোমাকে কোনও কাজই করতে হবে না। তুমি শুধু আনন্দ করো।

তা কি হয় নাকি?

হয় হয়। হওয়ালেই হয়।

আহুক বোস-এর সঙ্গে রংকিনী বাংলোর বাইরে এল। নামেই বাংলো। কাঠের ছটি মোটা থাম-এর উপরে একটা চালা। প্রায় এক মানুষ উঁচু। তার উপরে একটি মাত্র ঘর। তবে তিনদিকে ঘোরানো বারান্দা আছে কাঠের রেলিং-দেওয়া। ঘরটির মাথাতে কাঠের ফ্রেম-এর উপরে করোগেটেড শিট দেওয়া। ভিতরে বাঁশের চাটাই এর ফলস্ সিলিং। তেল চকচকে। বড় বড় জানালা। একটা দিকের দেওয়ালে শুধুই কাচ। পা থেকে মাথা

অবধি। এখানে উনি একা থাকেন তাই মনে হল প্রাইভেসির কোনও বালাই নেই। উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকলেও আকাশ, আকাশের পাখি জল আর জলের পাখি আর সমুদ্রের মাছেরা ছাড়া কেউই দেখবে না।

ভীবাপ্পানের কুঁড়েটা, আহুক বললেন, পাহাড়ের অন্যদিকে। তার নির্দেশমতই না কি তা বানানো হয়েছে। বাংলো থেকে কুঁড়ে অথবা কুঁড়ে থেকে বাংলো, দেখাই যায় না। ভীরাপ্পানও তার মনিবেরই মতো নির্জনতা এবং গোপনীয়তাবিলাসী মনে হয়। সত্যিই ভাবা যায় না যে প্রায় পৌনে দুই বর্গ মাইল এই গভীর এবং আদিম জঙ্গলময় দ্বীপে ওই দু'জন একা পুরুষ এমনভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকতে পারেন। দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভাষারও ব্যবধানের কারণে দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও বেশি হয় বলে মনে হয় না। তাতে নির্জনতা নিশ্চয়ই আরও গভীর হয়। এঁরা দুজনে এতদিনে পাগল হয়ে যাননি যে কেন, তা কে জানে!

বাইরে একটা ধুনি মতো জ্বলছে। তার দুপাশে দুটি বেতের চেয়ার। তার উপরে স্থানীয় কোনও ঘাসে-বোনা আস্তরণ। চেয়ারগুলো মনে হয় বাইরে পড়েই থাকে, রোদে-জলে-চাঁদে।

বোসো।

বললেন, আহুক।

তারপর বললেন, একেবারে চুপটি করে বোসো। "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এর তোমাকে কি বলার আছে তাই শোনো চুপচাপ বসে। প্রকৃতির বুকের কোরকে একবার পৌঁছে গেলে মৌনী হয়ে যেতে হয়। তবেই তো প্রকৃতি মুখ খোলেন।

আজকে বোধহয় শুক্লা-অষ্টমী। চাঁদ যখনই বেরিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে, মেঘের আড়াল থেকে, তখনই নিচের আধো-চাঁদা তটভূমি আর তার উপরের ঢেউ ভাঙা সাদা ফেনার ছলাৎ-ছলাৎ বিজ-বিজ-বিজ শব্দ ভেসে আসছে সামুদ্রিক হাওয়াতে। দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র চারদিকেই। আশ্চর্য এক অনুভূতি। এই সমুদ্রকে পোর্ট প্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলের সমুদ্রমুখি ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসেও দেখা যেত কিন্তু এখানে বসে যেন রংকিনীর মনে হচ্ছে সে একজন জাহাজ-ডুবী-হওয়া নারী। এই দারুচিনি দ্বীপে কাষ্ঠ-খণ্ড ধরে কোনওক্রমে বুঝিবা ভেসে এসেছে আর তার চারদিকে তাথৈ তাথৈ করছে বারিধি।

হঠাৎই পেছনের গভীর জঙ্গল থেকে কী একটা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হল। কামানের গোলা কি? জলদস্যুরা কি আক্রমণ করল "দ্যা হর্ণেট্স নেস্টকে"?

ভয় পেয়ে চমকে উঠল রংকিনী। ও চমকে উঠতেই আহুক বোস বললেন, আন্দামানী পেঁচা ডাকল। এই পেঁচাগুলো মূল ভূখণ্ডর, মানে, ভারতের পেঁচাদের থেকে অনেকই বড় হয়। হুতুম পেঁচার চেয়েও বড়। জানো তো। যে এখানের, মানে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বেশিরভাগ গাছগাছালি পাখপাখালিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা ENDEMIC।

ENDEMIC শব্দর মানে?

মানে, এদের শুধু এখানেই দেখা যায়, অন্য কোথাওই দেখা যায় না।

তাই? যাক বাবা। ঐ বুক কাঁপানো দুরগুম দুরগুম আওয়াজ শুনে আমি যা ভয় পেয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম, জল-ডাকাত পড়ল বুঝি দ্বীপে। এখানে যারা থাকেন, মানুষেরা, তারাও কি ENDEMIC?

হ্যাঁ। তারাও। মানে আদিম বাসিন্দারা। যেমন ওঙ্গে, আন্দামানী, জারোয়া বা নিকোবরের শোম্পেনদেরও অন্য কোথাওই দেখা যাবে না।

আর শ্রীযুক্ত আহুক বোসের মতো মানুষ?

বলেই, হাসল রংকিনী।

আহুকও হেসে ফেললেন।

বললেন, তাও ভাল যে, তুমি আমাকে আন্দামানী পেঁচা বা ইগুয়ানো বা নিকোবরী মেগাপড পাখিদের থেকে আলাদা করে একজন মানুষ বলে স্বীকৃতি দিলে। মানুষ পরিচয় তো আমার কবেই হারিয়ে গেছে।

মানুষ নয়তো আপনি কি?

কী জানি! হয়তো দ্বীপবাসী কোনও প্রাণী, কোনও বন-মানুষ।

তাই?

বলল, রংকিনী।

বলেই, চুপ করে গেল।

আহুক বললেন, ডাকাতেরা এখানে এখন না এলেও ভিনদেশি জাহাজ-ট্রলার সব ঢুকে পড়ে বৈকি। নানা ধান্দাতে তারা আসে। ভারতবর্ষর তো শত্রু কম নেই। তবে বেশিই আসে চুরি করে মাছ ধরতে।

আমাদের সামনে যে সমুদ্র তাই তো বঙ্গোপসাগর?

না। বঙ্গোপসাগর বাঁদিকে। "বে-আইল্যান্ড হোটেল" থেকে যে সমুদ্র দেখা যায় তা বঙ্গোপসাগর। কিন্তু আমাদের এই "দ্যা হর্ণেটস নেস্ট"-এর সামনে যে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছ তা হচ্ছে আন্দামান উপসাগর।

তাই?

তা কোন দেশের থেকে ঐসব জাহাজ বা ট্রলার আসে? শুধু আন্দামান উপসাগরেই আসে?

না, না, তারা বঙ্গোপসাগরেও আসে। বার্মা, মানে এখনকার মায়ানমার থেকেও আসে। ইরাবতী নদীও আমাদের গঙ্গারই মতো অনেক ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে নানা নামে নানা শাখা উপশাখাতে ভাগ হয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। ম্যাপ যদি দেখো, তাহলে দেখবে, গঙ্গার মুখ আর মায়ানমারের ইরাবতীর মুখের চেহারা প্রায় একই রকম। মাছধরা ট্রলার ও জাহাজ যে এদিকে আসে তাই নয়, তারা গঙ্গার মুখের সামনের বঙ্গোপসাগরেও চলে যায়। আরও আসে থাইল্যান্ড থেকে। উত্তর আন্দামানের কোকো

দ্বীপ থেকে মায়ানমারের প্রেপারিস দ্বীপ খুবই কাছে। ব্যাঙ্ক অফ মার্তাবন হয়ে আসে চোরা মাছ শিকারীরা। যেমন মধ্য আন্দামানেরও।

ওরা চুপ করতেই সমুদ্রের শব্দ জোর হল। চাঁদটাও মেঘমুক্ত হল। হেসে উঠল চাঁদের আলোয় ক্লোরোফিল উজ্জ্বল প্রকৃতি। আর ভেসে আসতে লাগল চারধারের ঝুঁকে-পড়া চাঁদের আলো-নিকোনো হরজাই-বন থেকে নানারকম ঝিঁঝির শব্দ, রাতচরা পাখির সংক্ষিপ্ত চকিত ডাক, বনের পাদদেশে নানা সরীসৃপের নড়াচড়ার আওয়াজ। যেন, ঘুমপাড়ানি গান শুনছে রংকিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে SOPORIFIC, তাই এখানের পরিবেশ। ভারি শান্ত নির্লিপ্ত এখানেব প্রতিবেশ। টানটান। স্নায়ু আলগা হয়ে আসে। ঘুম পায়। ঘুমোনো, বই পড়া, খাওয়া, বনের মধ্যে ঘোরা, সমুদ্রে-স্নান করা, তটে শুয়ে থাকা, তারপর আবার খাওয়া, গান শোনা, আবার ঘুমোনো এবং ঘুম থেকে উঠে কারো আদর খাওয়া বা কারোকে আদর করা, এই হওযা উচিত এখানের রুটিন। শহরের মানুষের জীবন থেকে, একদিন যেসব "সাধারণ" এবং "প্রাকৃতিক" সব আনন্দে মানুষ-মানুষী অভ্যস্ত ছিল, তার সবকিছুই এখন অন্তর্হিত হয়েছে। মানুষ আর মানুষ নেই। সারাক্ষণ খাই-খাই, চাই-চাই, আরও চাই-এর ROBOT হয়ে গেছে। অথচ ঈশ্বর সম্ভবত তাঁর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের এমন করুণ পরিণতি হোক আদৌ তা চাননি। শহুরে মানুষ-মানুষীর জীবন থেকে পূর্বিতা এবং পূর্বাপর জ্ঞানও অবলুপ্ত হয়েছে।

চুমকি বোধহয় এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল যখন "অন্য কম্পাস"-এর কথা বলছিল, সমুদ্রের মধ্যে মোটরবোটে করে 'দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এর দিকে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসতে আসতে।

রংকিনী বলল অনেকক্ষণ পরে, আপনি যে মেগাপড পাখির কথা বললেন, চুমকির মুখেও শুনেছি, এখানে মেগাপড-এর নামে হোটেল এবং একটা দ্বীপও আছে। কিন্তু সেটা কি পাখি? দেখিনি তো।

দেখবে কী করে? মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে এ পাখি নেই। MEGAPOD তো এখানেই শুধু পাওয়া যায়। "পাওয়া যায়" বলা বোধহয় ঠিক নয়, প্রায় অবলুপ্তই হয়ে গেছে। মেগাপড যে ডিম পাড়ে তা থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোয় স্বাবলম্বী হয়ে। মহা অকালপক্ক তারা। মেগাপড পাখি কিন্তু উড়তে পারে না। বিধাতার কী বিচ্ছিরি রসিকতা বলত? আমরা যদি হাঁটতে না পারতাম, শুধুই উড়তে পারতাম এবং রাতে গাছের ডালে বসে ঘুমোতাম তবে আমাদের যেমন অবস্থা হতো, মেগাপডদেরও তেমনই অবস্থা প্রায়।

পাখি, অথচ উড়তে পারে না এ আবার হয় না কি?

হয় হয়। সব হয়। এই প্রকৃতিতে কী না হয়? তোমার মতো সুন্দরী, বিদূষী যুবতী এইসব অভাবনীয় অসুবিধা সত্ত্বেও এই জঙ্গলে-ভরা দ্বীপে সাতদিন সাত রাত থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে তাও কি হয়? কিন্তু হল তো! কত কী হয়। প্রকৃতির বুকের কোরকের মধ্যে কী যে হয় আর কী যে হয় না, তা কি কেউই বলতে পারে? শেষ

পর্যন্ত কদিন ক'রাত থাকবে সেটা এখনও অনিশ্চিত কিন্তু একটা রাত তো থাকছ নিশ্চিতই। এও কি আদৌ ভাবনীয় ছিল? একটি রাত যে-কোনও মানুষ বা মানুষীর জীবনকে যেমন লণ্ডভণ্ড করতে পারে তেমন সমাহিতও করতে পারে, বিন্যস্ত।

রংকিনী কথা না বলে চুপ করে আহুকের চোখে চেয়ে রইল। ধুনীর আগুনে আহুক বোস-এর দুটি চোখের উজ্জ্বল তারা নানারকম রঙ উড়োচ্ছিল। একবার সবুজ, একবার লাল, জঙ্গলে বড় বাঘের চোখে রাতে আলো পড়লে যেমন হয়। দেখেছিল, বান্ধবগড়ে।

আহুক বললেন, আন্দামান নিকোবরের মেগাপড-এর মতোই মালয়েশিয়াতে একরকম পাখি আছে, সেও প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রায কেন, হয়ত অবলুপ্তই হয়ে গেছে পুরোপুরি এতদিনে, যার নাম ডোডো। যে মানুষ পৃথিবীতে থাকে অথচ হাঁটতে পারে না তার পক্ষে বাঁচা যেমন মুশকিল, তেমনই যে পাখিরা উড়তেই পারে না শুধু হেঁটে বেড়ায়, তাদের পক্ষেও বাঁচা মুশকিল।

কোন কোন পাখি উড়তে পারে না? তিতির বা নানা ধরনের পাট্রিজও তো উড়তে পারে না। রংকিনী বলল।

কে বলল? তারা উড়তে অবশ্যই পারে তবে খগচর বলতে আমরা যেমন উড়ন্ত পাখি বোঝাই তেমন পাখি নয়। মাটিতেই বেশি সময় থাকে, যেমন ময়ূর, যেমন বন-মুরগি। মালয়েশিয়ার ডোডোরই মতো হাওযাইয়ান দ্বীপপুঞ্জেও একরকম বড় পাখি দেখা যায়, এখন তারাও প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, যাদের নাম 'নেনে'। ডোডো এবং নেনেও কিন্তু "ENDEMIC"। সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জেও একরকমের RAILS দেখা যায় তারাও উড়তে পারে না।

RAILS কী?

পাখি এক রকমের।

সেশ্যেলস-এর কথা চুমকিও বলছিল। আপনিও কি গেছেন?

হ্যাঁ। গেছি বইকি। সারা পৃথিবীতেই ত ঘুরে বেড়িয়েছি।

কেন? কিসের খোঁজে? গুপ্তধন?

আহুক হেসে বললেন, না, তা নয়। তবে পেলে মন্দ হতো না। তাছাড়া গুপ্তধন তো সবসময়ে নিষ্প্রাণ পদার্থ নাও হতে পারে।

মানে?

অনেক প্রাণবন্ত গুপ্তধনও থাকে, যা অন্য মানুষ অথবা মানুষীকে প্রাণিত করে।

তাই? করে বুঝি?

করেই তো।

হেসে বললেন, আহুক।

তারপর বললেন, তোমাদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, যা শিখেছি তা নানা দেশ ঘুরেই। ট্রাভেলিং ইজ দ্যা বেস্ট এডুকেশান। যদি অবশ্য চোখ-

কান-নাক খুলে ট্র্যাভল করো। তুমিও যেয়ো সেশ্যেলস-এ একবার। হানিমুন করতে গেলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

হানিমুন করতে?

হেসে, কিন্তু বোকার মতো এবং কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েও যেন বললেন, আহুক।

আমার আপত্তি নেই। আপনার আপত্তি না থাকলেই হল। যেখানে পূর্ণচাঁদ সেখানেই তো হানিমুন।

আমি যে তোমার বাবার বয়সী। কোনও বাবার বয়সী মানুষ কি পারে মেয়ের বয়সী কারো সঙ্গে জীবনে দৌড়তে? তাকে সুখী করতে?

জীবন মানে কি শুধুই দৌড়?

কে জানে! জীবন মানে যে কী? তা যদি জেনেই ফেলতে পারতাম তবে তো আমি লেখকই হতাম। একটি মাত্র বই লিখেই নোবেল প্রাইজ পেতাম। জীবনের মানে জানা আর হল কই? কজনই বা তা জানতে পারে?

এতো দেশ যে দেখলেন, তার মধ্যে কোন দেশ সবচেয়ে ভাল লেগেছে আপনার?

নিজের দেশ। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"। শুধু দেশের নেতারা যদি আন্দামানী পেঁচা না হয়ে মানুষ হতো তবে এই পঞ্চাশ বছরে এদেশের চেহারা যে কী হতে পারত তা তোমরা ধারণাও করতে পারো না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমার পা পড়েছে বলেই তুলনা করতে পারি আমি।

তুলনা করে কী মনে হয়?

কী আর মনে হবে? দুচোখ জলে ভরে যায়।

বলেই, আহুক চুপ করে গেলেন।

এর পরে দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

খুব কাছে থাইল্যান্ডের টেনাসেরিস অঞ্চল। সারগুই দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসে জাহাজগুলো। মগ দস্যুদের নাম শুনেছ তো? মগ বাবুর্চি? "মগের মুল্লুক" কথাটা শুনেছ? বর্মীদেরই আরেক নাম তো মগ। বাংলাদেশের চাঁটগার আর মায়ানমারের আরাকানের বাবুর্চিদের হাতের খানা যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা।

ঈসস্। জীবনটা তাও শুধু একটা কারণেই বৃথা হলেও না হয় বুঝতাম। তাহলে তার প্রতিকারের কোনও বন্দোবস্ত করার চেষ্টাও না হয় করা যেত। কিন্তু কারও জীবন যদি এতোগুলো কারণে বৃথা হয় তবে তো জাহাজডুবি হওয়ার চেয়েও খারাপ।

বলেই হেসে উঠল রংকিনী।

আহুকও হাসলেন।

আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছিল। ষাটোর্ধ্ব হলেও অত্যন্ত সুগঠিত চেহারার, সুস্বাস্থ্যর আহুককে সেই আগুনের কম্পমান আলোতে বাদামি রঙা দেখাচ্ছিল। একদিন তাঁর

গায়ের রঙ যে ফর্সা ছিল খুবই আজও বোঝা যায়। "সানট্যানড" বলতে কী বোঝায় তা আহুক বোসকে দেখে জানতে হয়। সামনের দিকে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। নাকটা চাপা। খাড়া হলে কেমন দেখাত, কে জানে। হয়ত পশ্চিম-দেশের সাহেবদের মতোই দেখাত। কিন্তু এই সামান্য চাপা নাক এক আলগা আলাদা আভিজাত্য দিয়েছে আহুক বোসকে। হাসিটি ভারি সুন্দর। ঝকঝকে দাঁত। নড়েনি। পড়েনি। রাবারের স্লিপার পরে, জিন-এর খাটো শর্টস এবং আডিডাস-এর খয়েরি রঙা গেঞ্জিতে বাঙালি বলে একেবারে মনেই হচ্ছে না তাঁকে। তাঁর তলপেটের কাছে সামান্য মেদ আছে। কিন্তু শরীরের আর কোথাওই মেদ নেই। ধিকি ধিকি আগুনের সামনে বসা চারিদিকে সমুদ্র-ঘেরা এই নির্জন দ্বীপের রবিনসন ক্রুসো আহুক বোস-এর দিকে তাকিয়ে রংকিনী ওর শরীরের মধ্যে এক অননুভূত স্পষ্ট রিকিঝিকি অনুভব করল। এই শারীরিক অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি ওর এই চৌত্রিশ বছরে। হঠাৎই ভীষণ ভয় করতে লাগল। আন্দামানী পেঁচার ডাক শুনেও অত ভয় করেনি।

রংকিনী ভাবছিল যে, ও ঠিকই বলেছিল এখানে আসবার সময়ে চুমকিকে। বলেছিল যে, রংকিনী নিজেকে যতখানি ভয় পায় ততখানি ভয় আর কারোকেই পায় না। নিজের বাঁচন, নিজের মরণ, নিজের নিয়তি সে তার নিজের দুই সুন্দর বুকের মধ্যেই জীবন-কাঠি মরণ-কাঠিরই মতো বয়ে বেড়াচ্ছে জন্মাবধি। ও জানে, ও জানে সে কথা। শি হ্যাজ স্টারড দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট। কিছু একটা অঘটন ঘটবে এখানে। চুমকি এই দ্বীপের রহস্য জানে বলেই একটি রাতও কাটায়নি এখানে আজ অবধি। সেকি রংকিনীর বন্ধু? না শত্রু?

আহুক বোস রংকিনীর দিকে চেয়েছিলেন। জংলা কাজের হালকা সবুজ সালোয়ার -কামিজে আগুনের মধ্যে থেকে প্রতিসরিত আলোর প্রজাপতিরা নাচানাচি করছিল। স্ফুলিঙ্গর মতো জ্বলছিল নিভছিল রংকিনীর চোখের তারায়। বাঁ হাত দিয়ে তাঁর সল্ট অ্যান্ড পেপার দাড়িকে মুঠো করে ধরে আহুক চেয়েছিলেন রংকিনীর দিকে। রংকিনীর শারীরিক সৌন্দর্যকে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ধার দিয়েছে ওর বুদ্ধিমত্তা, রুচি এবং সম্ভবত ওর শিক্ষাও। এই প্রসাধনের চেয়ে সুন্দরতর প্রসাধন, কী পুরুষ, কী নারী কারোই ইপ্সিত নয়। এই প্রসাধন পারি শহরের সম্ভ্রান্ততম বিউটিসিয়ানের পার্লারে গিয়েও কিনতে পারা যায় না কোনও অর্থমূল্যেই। যার চোখ আছে দেখার, শুধু সেই এই প্রসাধম চেনে। সব জিনিস সকলের জন্যে নয়।

আহুক ভাবছিলেন, টিটিঙ্গি আর তার বিয়ের পরে পরেই যদি কোনও সন্তান জন্মাত এবং যদি আরও কয়েক বছর আগে বিয়ে করতেন তবে আজ হয়ত রংকিনীর সমবয়সী একটি মেয়ে নিঃসন্তান আহুকের থাকতে পারত। নিজের কোনও সন্তান নেই তাই অপত্যবোধ কাকে বলে তা জানার সুযোগ তাঁর হয়নি এ জীবনে। এক গভীর বোধ থেকে তিনি এ জীবনে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। তাই সববয়সী নারীকেই নারীর পূর্ণ মহিমাতে প্রেমিকা হিসেবেই দেখতে তিঁনি অভ্যস্ত।

ঘুম পায়নি? সেই কাকভোরে তো উঠেছ? সারাদিনে বিশ্রামও তো পাওনি একটুও।

আহুক জিগোস করলেন।

বিশ্রামই বিশ্রাম। আমাকে যে কী টেনসান-এ থাকতে হয় সারাদিন তা আপনি অনুমানও করতে পারবেন না। শুধু দিনই বা কেন? রাত-দিন যে কোনও সময়েই। ভারি বিশ্রী কাজ। তবে চুমকির অত রকমের বাণিজ্যর মতো অত যাচ্ছেতাই নয়। অবশ্য ওর আয়ও সেইরকম। কিন্তু নিজের উপার্জিত টাকা নিজে হাতে যে একটুও খরচ করবে সেই সময়টুকুও পায় না বেচারী। সত্যি বলছি। এখানের প্রতিটি মুহূর্তই তাই বিশ্রাম আমার। তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করছি।

অনুভব না উপভোগ?

ঐ হল। অত ভাল বাংলা জানি না আমি।

তুমি কি আরেকবার চান করবে শোওয়ার আগে? এখানে না আছে এসি, না ফ্যান। ঘেমে-চুমে তো একাকার। হিউমিডিটিও আছে।

জলে টান পড়বে না?

কী জন্যে?

না, চান করলে।

তা পড়বে না। তবে তোলা জলে চান করবেই বা কেন এখানে এসে! সমুদ্রে চান করো।

এই রাতের বেলা?

রাত আর দিনে তফাত কি? এই দ্বীপের মালকিন তো তোমার বন্ধু। তার বকলমে আমি! আমি না হয় এই দ্বীপের চারদিকের তটভূমির মালিক করে দিলাম তোমাকেই। এমন সুযোগ পাবে কোথায়? তবে সাঁতার জানো তো ভাল?

তা জানি। কিন্তু স্যুইমিং-পুলে সাঁতার কাটা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা তো এক নয়।

তা নয়। তবে সমুদ্রে সাঁতার কাটার চেয়েও অনেকই কঠিন জীবনে সাঁতার কাটা। সেখানেই যখন পটু-সাঁতারু হয়েছ তখন সমুদ্রে ভয় কি?

তারপরই বললেন, স্যুইম-স্যুট এনেছ তো?

এনেতোছি! কিন্তু সেতো হোটেলেই রয়ে গেছে স্যুটকেস-এ। হোটেলের সুইমিং-পুলটা ছোট তাই আমাদের দুজনের কেউই জলে নামিনি।

স্যুইম-স্যুট না এনেছ না এনেছ বার্থডে স্যুটটা তো এনেছ সঙ্গে করে। এখানে তোমাকে দেখছেটো কে? তোমাকে তো আগেই বলেছি। এমন দ্বীপের মালিকানা গ্রিস শিপিং-ম্যাগনেট আরি ওনাসিস আর জ্যাকুলিন কেনেডি বা লেডি ডায়ানা আর ডোডিদেরই মানায়। আমাদের মত প্যাতি আর ভীতু আর পুতুপুতু মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালিরা এই সম্পদের মূল্য বুঝব কী করে! এই মালিকানার দামই বা দেব কি করে।

আমার মধ্যে যে একজন "জ্যাকুলিন" বা "লেডি ডি" নেই, তা আপনি জানলেন কী করে?

আমি কী করে জানব? আছে কি না তা তো তোমারই জানার কথা। থেকে থাকলেও থাকার লক্ষণ এখনও প্রকট হয়নি।

কথা ঘুরিয়ে রংকিনী বলল, রাতের বেলা সি-বিচ-এ সাপটাপ থাকে না?

প্রত্যেক মেয়েই গুগলি-বোলার। কোন কথা কোথায় ফেলে কোন দিকে কেমন করে ঘোরাতে হয়, তা তাদের মতো, পৃথিবী-খ্যাত পুরুষ বোলারেরাও জানে না।

আহুক বললেন, ভয় পাচ্ছ চান করার সময়ে কামড়ে দেবে বলে?

হ্যাঁ। পাচ্ছিই তো। এমন অভিজ্ঞতা তো কোনওদিনও হয়নি। পুরী কী গোপালপুর কী কোভালম এও তো সন্ধের পরে কেউই থাকে না সি-বিচ-এ।

থাকে না ঠিকই। তবে সেটা মানুষেরই ভয়ে। কাঁকড়া বা অন্য কিছুর ভয়ে নয়। মানুষের মতো ভয়াবহ জীব এই পৃথিবীতে আর তো নেই!

তা তো বটেই! বিশেষ করে পুরুষ মানুষ।

আহুক বললেন, ড্যালহাউসি স্কোয়ারে যত শ্বাপদ আছে তত তো ভারতের কোনও জঙ্গলেও নেই। এখানে মানুষের ভয় নেই। আমাকে পুরুষ বলে গণ্য কোরো না। আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাবই না। তোয়ালে দিচ্ছি। চলে যাও। এখান থেকে তো তটভূমি দেখাও যায় না। যদি দেখা যেতও তবেও চাঁদের আলোতে কোনও MERMAID বা জিন বা পরী তটভূমিতে নেমেছে সমুদ্রে জলকেলি করতে মনে হতো, অস্পষ্ট, রহস্যময়ী তাকে, দূর থেকে। চোখ দিয়ে ছুঁলে তাতে তো জিন বা পরীর কিংবা MERMAID-এর সতীত্ব নষ্ট হতো না! তবে, এতো ভয় কিসের তোমার?

হঠাৎই রংকিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাব চান করতে। একটা তোয়ালে দিন।

শুধুই তোয়ালে? তোমাকে নতুন সাবানও দেব।

কি সাবান?

চন্দন সাবান। তারপরে আতরও দেব।

কী আতর?

ফিরদৌস।

আতর কি করে মাখে তা আমি জানি না। আতর তো মাখে মুসলমানেরা।

মুসলমানেরাই তো জানে জীবন কি করে উপভোগ করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া আদর-সোহাগ তো তাদের কাছ থেকেই শেখার ছিল সকলেরই। বোকারা শিখল না, তা কি করা যাবে!

আতর মাখতে অনেকেই জানে না। সবকিছুই শিখতে হয়। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। থাকো তুমি কটা দিন এখানে তোমাকে শেখাব কী করে ভালবাসতে হয় জীবনকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। তুমি সম্পূর্ণ অন্য নারী হয়ে ফিরবে এখান থেকে।

আর যদি না ফিরি?

তোমার খুশি। তবে হাতে অনেকই সময় আছে সিদ্ধান্ত নেবার। তার উপরে শয়তানের ভর হলে তবেই মানুষে তাড়াহুড়ো করে। কখনও তাঁড়াহুড়ো কোরো না। কী কাজে, কী খেলায়। তাড়াহুড়ো করলেই স্টাম্প-আউট হবে।

কাঁকড়া নেই বিচ-এ? সত্যি তো।

তোমার খাওয়ার জন্যে কাঁকড়া আছে জালাতে। এখানে অতিথি এলে যাতে অপ্রস্তুতে না পড়তে হয় তাই কাঁকড়া রাখা থাকে। তবে সে সব বড় কাঁকড়া জেলেদের কাছ থেকে কেনা। জিয়োনো থাকে। সি-বিচ এ কাঁকড়া নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আহ্বক বললেন, তবে ভয়ের মধ্যে একটি ভয় আছে।

কী?

একটা খুব বড় মেয়ে টুনা মাছ।

মাছটি যে মেয়ে, তা জানলেন কি করে?

সে যে আমার প্রেমিকা। কত গল্প হল সেদিন তার সঙ্গে। তাকে ধরার জন্যে কতদিন ধরে প্রাণপাত করছি কিন্তু ধরতে পারিনি। কিন্তু সেদিন সে নিজেই ধরা দিল।

ধরেছেন। কই? দেখি। খুব বড় মাছ?

খুবই বড়। তবে যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় তাকে কি ধরা যায়? না খাওয়া যায়? কোনও ভদ্রলোক পুরুষই তা করতে পারে না। মাছ তো ধরে, ধরেছে কত মানুষেই, কিন্তু মাছের সঙ্গে প্রেম করেছে এমন একজন মানুষকেও কি তুমি জানো স্বদেশে বা বিদেশে!

আপনি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ।

অদ্ভুত কী! বল কিম্ভূত। নইলে এই হর্ণেট্স নেস্ট-এ কেউ থাকে? একা একা?

এখানে নাকি অনেক প্রেতাত্মা আছে?

থাকতে পারে। অনেকেই বলে আছে। তবে আমি নিজেই বাঘা-ভূত বলে কোনও lesser ভূত আমার সামনে সাহস করে আসেনি এ পর্যন্ত। ভীরাপ্পানের সঙ্গে নাকি একটা শাকচুন্নী আর একটা ব্রহ্মদৈত্যের দেখাও হয় মাঝে মাঝে। শাকচুন্নী থাকে একটা অর্জুন গাছে আর ব্রহ্মদৈত্যটা থাকে বহু প্রাচীন এক প্যাডক গাছে।

শাকচুন্নী আর ব্রহ্মদৈত্য ত বাঙালি ভূত।

ঠিকই। ভীরাপ্পান তেলুগু নামেই ডাকে তাদের। তবে তাদের চেহারার যা বর্ণনা দেয় তা শুনেই আমি তাদের বাঙালিকরণ করেছি।

সেটা ভালই করেছেন।

ভীরাপ্পান মাঝে মাঝে দিনমানে গিয়ে তাদের ভেট-টেটও দিয়ে আসে।

কী ভেট? খাবার?

না না। খাবার-টাবার নয়। এত বড় দ্বীপ রয়েছে, চারদিকেই সমুদ্র তাদের, খাদ্য-পানীয়র অভাব নাকি?

তবে কি ভেট দেয়?

শাকচুন্নীকে দেয় লালরঙা শায়া, চুল বাঁধার লাল রিবন। কুড়ি গজ মার্কিন কাপড়ে তৈরি হয় সেই সায়া। তাবপর রঞ্জক সাবান দিয়ে অনেক যত্নে লাল রঙ করে ভীরাপ্পান। অদ্ভুত সাইজ। লম্বাতে পেল্লাই অথচ কোমরের মাপ তোমারই মতো।

লজ্জা পেল রংকিনী।

মনে মনে বলল, আমার কোমরের মাপ আপনি জানলেন কোত্থেকে?

তারপরে বলল, সেই শাকচুন্নী কি অন্য রঙের সায়াও পরে?

আরে না! কিছুই পরে না। একদিন ভীরাপ্পানের সঙ্গে ভর সন্ধ্যায় মিষ্টি জলের পুকুরের পারে নাকি তার দেখা হয়েছিল। একেবারে উদোম। তারপরে এরকম লেঙ্গথ উইদাউট ব্রেথ অ্যান্ড ব্রেস্টস চেহারা! ভীরাপ্পান তো এমনিতেই পয়লা নম্বরী নারী-বিদ্বেষী, জীবনে নারী সঙ্গ করেনি, নগ্না রমনী দেখেওনি, সেই পড়ল তো পড় উদোম শাকচুন্নীর খপ্পরে। লজ্জা পেয়ে, ভয় পেয়ে, জিভ কেটে দৌড়তে দৌড়তে এসে সে তার সেই নগ্নিকামূর্তি দর্শনের বর্ণনা দিল তার খিচুড়ি ভাষাতে। সেই বর্ণনা যদি তুমি শুনতে! তেলুগু, তামিল, হিন্দী এবং ইংরেজি মেশানো সে কী অপাচ্য পাঁচন! পাছে তাকে নগ্নিকা আবারও দেখা দেয় সেই ভয়েই বীরাপ্পান তাকে তুষ্ট করে চলেছে।

রংকিনী হেসে উঠল খুব জোরে।

হেসে উঠেই চুপসে গেল। বহু বছরের মধ্যে এমন নির্দোষ আনন্দর ভাগীদার যে সে হয়নি তা হঠাৎই বুঝতে পেল। এমন অট্টহাসিও হাসেনি বহুদিন যে, সে কথাও। বুঝল যে, তার মধ্যে থেকে ঘুমিয়ে-থাকা অন্য একজন রংকিনী আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলছে এক এক করে। যে রংকিনীকে ও চিনত না। জানত না কখনওই।

হাসির দমক সামলে উঠে বলল, আর ব্রহ্মদৈত্যকে কী ভেট দেয় ভীরাপ্পান?

তাকে দেয় খেটো ধুতি, কাঠের খড়ম দু'হাত লম্বা বাঁশের বাখারির তৈরি কান-খুসকি আর কালো নারকোল-এর খোলের মালা।

বাঃ।

বাঃ কেন?

শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে আমার, তাই বাঃ।

চানের কী হল?

আজ থাক। আগে দিনমানে কাল সব দেখে-টেখে নিই। তটভূমির কোন জায়গাটি সবচেয়ে রোম্যান্টিক সে জায়গাটা আবিষ্কার করি তারপরে মন যদি লাগে, ভয় যদি কাটে, তবে না হয় রোজই রাতেও চান করা যাবে।

আমাকে সঙ্গে নেবে তো? লাইফ-গার্ড ছাড়া কিন্তু যাওয়াটা ঠিক হবে না।

নিতেই পারি। ভেবে দেখব। চানঘরে সবাই একাই যায় কিন্তু সমুদ্রস্নানে যায় সদলেই।

কথাটা যেন কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। কোনও বাংলা উপন্যাসে কি?

ইয়েস স্যার। 'চানঘরে গান'। পত্রোপন্যাস।

তুমি বাংলা বই পড়ো নাকি?

আমি পড়ি। কিন্তু চুমকি বলে বাঙালি সাহিত্যিকেরা সবাই "আতা ক্যালানে"।

হো হো করে হেসে উঠলেন আঙ্কল। বললেন, গ্রেট। শি ইজ রিয়্যালি গ্রেট। একেবারে ওরিজিনাল ওর সব অভিব্যক্তি। দারুণ মেয়ে কিন্তু তোমার বন্ধু ঐ চুমকি।

আপনি পড়েন?

পড়ি। তবে খুব বেছে বেছে। চুমকি খুব খারাপ বলেনি কথাটা। তবে এমন জেনারালাইজ করাটা ঠিক না। ইংরেজিতেই বা কি লেখা হচ্ছে? সাহিত্যিক বল, গায়ক বল, আঁকিয়ে বল সর্বত্রই এখন আতা-ক্যালানে পায়ে-তেল-মাখানোদের যুগ। নয়তো এস্টাব্লিশমেন্টের আত্মসম্মানজ্ঞানহীন চাকর, কুকুর-মেকুরের দিন এখন।

তারপর বলল, আপনি এখানে খবরের কাগজ তো পান না, ইলেকট্রিসিটিও নেই যে টিভি দেখবেন, আপনার পাগল-পাগল লাগে না। পৃথিবীতে রোজ কত কী ঘটছে তার কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন না, আপনার আই কিউ তো একেবারেই নেমে যাবে।

আমি তো আর কারো কাছে চাকরির জন্যে ইন্টারভ্যু দিতে যাচ্ছি না। এখন তো সব কিছুরই মূল্যায়ন টাকাতেই। যার বেশি আই কিউ সে বেশি মাইনের চাকরি পাবে। ওসব Pettifogging থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। বেশ আছি। খবরের কাগজ পড়ে হয়টা কী? কাগজওয়ালাদের বড়লোক করা ছাড়া? মিসেস মার্গারেট থ্যাচার, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে কি লিখেছিলেন জানো, খবরের কাগজ সম্বন্ধে?

কী?

"If what the press wrote was false. I could ignore it, and if it was true. I already knew it" ... ...". I learned to sheild myself from newspapers by the simple expediency of not reading them."

রংকিনী হাসল শুনে। বলল, বাঃ। ওঁর জীবনীর নাম কি? আত্মজীবনী?

হ্যাঁ। নাম হচ্ছে "THE PATH TO POWER"। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যোগাড় করে পড়ে ফেলো।

রংকিনী চুপ করে রইল।

তারপরেই হাতঘড়ি দেখে আঁৎকে উঠল। বলল, ইসস্! সাড়ে-এগারোটা।

আজই ঐ বিচ্ছিরি জিনিসটিকে হ্যান্ড ব্যাগে পুরে ফেলো। যত নষ্টের গোড়া। আসলে এই ঘড়িই আমাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে। আমি একে একেবারেই বর্জন করেছি। ক্যালেন্ডারকেও। আমার জন্মদিন কবে তা আমি জানতে পারি না। মৃত্যুদিনও জানবে শুধু ভীরাপ্পান। অবশ্য যদি সেইসময়ে সে এখানে থাকে। ও না থাকলে জানবে সামুদ্রিক পাখিরা। যারা এসে বসবে আমার শবের উপরে। কী শান্তি বলো ত! শান্তি কি শুধু আমারই! শান্তি কত মানুষের! যারা উঠতে বসতে আমার

মৃত্যুকামনা করেছে তাদেরও ফুল হাতে করে আসতে হবে না মৃতদেহের কাছে। আমার আত্মাও বেঁচে যাবে মৃত্যুর পরেও সেইসব দুরাত্মার সংস্পর্শ থেকে। তোমরা সভ্য সমাজের মানুষেরা প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা যাই করো, তার খুব কমই মানুষের মতো কাজ। তোমরা তোমাদের ঘড়ির চাকর. মনিবের চাকর, অভ্যেসের চাকর, চক্ষুলজ্জার চাকর, সামাজিকতার চাকর, লোকভয়ের চাকর। সকলেরই চরণ ছুঁয়ে বেড়াচ্ছ তোমরা।

বাঃ। তবুও সমাজকে কি একেবারে বর্জন করলে চলে?

সমাজ? যে সমাজ তোমার ভাল হলে ঈর্ষায় সবুজ হয়ে যায়? যে সমাজ তোমার ক্ষতি হলে উল্লাসে মেতে ওঠে? সেই ভণ্ড সমাজের মেকী মানুষদের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে পায়ে-পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই একদিন দেখতে পাবে যে, আমার মতো বুড়ো হয়ে গেছ। তারপর একদিন মরেও যেতে হবে। মিছিমিছি। বুঝবে যে মিছিমিছি জন্মে মিছিমিছিই মরে গেলে। না বাঁচলে এ জীবনে নিজের জন্যে, না সত্যি সত্যিই পরের জন্যে। চুমকির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তোমরা এই সভ্য, সংস্কৃত, শিক্ষিত, সামাজিক সব জীবেরা প্রত্যেকেই এক একটি আতা-ক্যালানে।

রংকিনী চুপ করে ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল।

আহুকও চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ।

হঠাৎই এক সময়ে উঠে পড়ে বললেন. ওঠো। এবারে শুয়ে পড়ো গিয়ে।

আপনি কোথায় শোবেন? বিছানা তো একটাই।

জানি। বিছানাতে নতুন ধোওয়া ও ইস্ত্রী-করা চাদর পেতে দিয়েছি। বদলে দিয়েছি বালিশের ওয়াড়। আতর লাগিয়ে দিয়েছি বালিশে, পাশ-বালিশে। ফুল ছড়িয়ে দিয়েছি বালিশের পাশে।

কী আতর?

শাবে দুলহান।

তাতো হল, আপনি শোবেন কোথায়?

বারান্দার ইজিচেয়ারে।

সে কি? রাতে যদি বৃষ্টি আসে?

যদি কেন, বৃষ্টি তো আসবেই।

তবে?

তবে কি? তোমার বিছানা থেকে শাবে দুলহান-এর গন্ধ উড়ে আসবে বৃষ্টিভেজা হাওয়াতে। চেয়ারে আমি অন্য কাতে শোব তখন। কী করা যাবে? বিছানা আর খাটত একটাই।

কিন্তু খাটটা তো মস্ত চওড়া।

তা চওড়া। বিবাহিত দম্পতিরা অনায়াসে শুতে পারেন।

আমি যে অন্য কারো সঙ্গেই শুতে পারি না।

রংকিনী অসহায়ের গলাতে বলল।

আমিও না, আহুক বললেন। তারপরই বললেন, কী মিল বলতো দুজনের। সারা রাত কি কারও সঙ্গেই শুয়ে থাকা যায়? আমি তো ভাবতেই পারি না। ভাল্লুকের সঙ্গে তবু হয়ত পারি কিংবা আন্দামানী শুয়োরের সঙ্গে কিন্তু কোনও যুবতীর সঙ্গে? নেভার। কোনও সুন্দর কিছুকেই বেশিক্ষণ একটানা কাছে, অত কাছে রাখতে নেই। ফুলেরই মতো সৌন্দর্য, রহস্য, সুগন্ধ তাতে দলে গিয়ে মলিন হয়ে যায়। এই তো ভাল। কত যে ভাল, তা এখানের এক একটি করে রাত পোয়াবে আর বুঝতে পারবে। তুমি তো ছোট্ট মেয়ে। খুকিটি। তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

রংকিনী অবাক হয়ে ঐ কিম্ভূত মানুষটির দিকে চেয়েছিল।

আহুক বললেন, এখানে অভাব শুধু একটাই জিনিসের।

কিসের?

আয়নার। আয়না নেই কোনও। তোমার যখনই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হবে আমার সামনে আসতে হবে তোমাকে।

সে কি? কেন?

আমার চোখই তোমার আয়না।

তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবারে শুয়ে পড়ো। কাল একেবারে ভোরে, আলো ফোটার আগে আগে আমরা বেরিয়ে পড়ব। তোমাকে পুরো দ্বীপটি ঘুরিয়ে দেখাব। "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"। এখনও ঝড়ে-পড়া ভাঙা জাহাজের অংশ দেখতে পাবে তটের উপরে। যদি চাও তো গুপ্তধনও খুঁজে দেখতে পারো। অনেকে বলে, সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য দ্বীপেরই মতো, সেখানের বো ভাঁলো তটেরই মতো, এই "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এও অনেক গুপ্তধন পোঁতা আছে। রাতের বেলা তো সব প্রেতাত্মারা নাকি সেইসব ধনই পাহারা দেয়। যক্ষ আর যক্ষিনী আছে নাকি অনেক।

ভয় দেখাবেন না আমাকে।

ভয় দেখাচ্ছি না। Mere statement of fact.

এই সেজ-বাতিটা ঘরে জ্বললে সারারাত আমি শোব বা ঘুমোব কি করে? জানালাতেও তো কোনও পর্দাটর্দা নেই। বাতি জ্বললে ঘুমুতে পারি না আমি। তাছাড়া এমন-আব্রু-হীন ঘরে...

তোমার কোনও ভয় নেই। শোওয়ার আগেই বাতির শিখা কমিয়ে দিয়ো। চাঁদের আলো থাকবে। এখন শুক্লপক্ষ। সারা রাতই চাঁদ থাকবে, মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়লেও। সুন্দর সব স্বপ্ন দেখো তুমি আজ ঘুমের মধ্যে। কাল সকালে তোমাকে একটি ফুল-ফোটা গাছের নিচে নিয়ে যাব। গাছটি অস্ট্রেলিয়ান। সাদা সাদা ফুল ধরে। মূল ভূখণ্ডে ফুল ধরে মার্চ মাসে আর শেষ হয় এপ্রিলে। অথচ এখানে, দেখো ডিসেম্বরে ফোটে।

কী নাম?

গ্লিনিসিডিয়া সুপার্বা।

বলেই, বললেন, তুমি কখনও পালামৌর বেতলাতে গেছ? যেখানে টাইগার প্রজেক্ট হয়েছে?

না।

বেতলার মূল বন-বাংলোর হাতাতে, বাংলোর আর বাওযার্চিখানার মধ্যে এই গাছ আছে একটি। গাছটি তো দেখে সকলেই, ফুলও দেখে, কিন্তু চিনে রাখে কজন বল? কখনও গেলে গাছটিকে দেখে এসো।

বলেই, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আর এদিকে এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যদি এ জীবনে আবারও কখনও আসো তবে এই আহুক বোস-এর খোঁজ কোরো "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এ এসে। বেতলাব গাছটা থাকবে অনেকই দিন তবে আমি যে থাকবই তা কে বলতে পারে! গাছ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, নালা, কুমির, কচ্ছপ সকলেই মানুষের চেয়ে অনেকই বেশি আয়ু নিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে। অথচ পরম বুদ্ধিমান মানুষ এই কথাটাই সবসময়েই কেমন ভুলে থাকে। বাঁচো, বাঁচো, বাঁচো রংকিনী। দারুণভাবে বাঁচো।

তাহলে এবারে তুমি দরজাটা বন্ধ করে নাও। বাথরুমের বাতিটা জ্বলে সারারাত। সাপখোপ আছে তো। ওটা নিভিয়ো না। তবে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো। শোবার ঘরের বাতিটা না নেভালে চাঁদ আর সমুদ্রকে উপভোগই করতে পারবে না। বিছানাতে শুয়ে শুয়েই দেখবে সমুদ্র তোমার দিকে অপলকে চেয়ে আছে আর চেয়ে আছে চাঁদ। চানঘরে তোয়ালে-সাবান সব আছে। গুডনাইট।

গুডনাইট। বলেই, রংকিনী বলল, দরজা বন্ধ করে দিলে রাতে আপনার যদি বাথরুমে যেতে হয়...

কোনও চিন্তা নেই। এতো বড় দ্বীপে সে সব কোনও ব্যাপারই নয়। আমি তো জংলিই।

আমাকে পাহাবা দেবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে কে পাহারা দেবে?

মানে?

আমার লোভকে?

লোভ? কিসের লোভ?

নাঃ কিছু না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। সব কথার পিঠে কথা বলতে নেই। সব প্রশ্নের উত্তরও চাইতে নেই। উত্তর হয় না সব প্রশ্নর। তুমি সত্যিই একটা ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে।

আর আপনি একটি ...

মুখে কিছুই বলল না রংকিনী।

মনে মনে বলল অনেক কথা। তবে সেগুলোর একটিও নিন্দাবাচক নয়।

নতুন জায়গা। তারপর বড় বড় খোলা জানালা। বারান্দাতে শুয়ে একজন সদা পরিচিত, সানট্যানড, অভিজ্ঞ, শক্ত-সমর্থ শরীরের পুরুষ মানুষ। যতই বুড়ো বুড়ো করুন নিজেকে, বুড়ো যে মানুষটি আদৌ নন তা না বোঝার মতো বোকা রংকিনী নয়। ইংরেজি প্রবাদ বলে After forty — Naughty।

গত কালই চুমকি বলছিল, আহুক বোস অন্য ধরনের পুরুষ।

কি রকম?

রংকিনী জিজ্ঞেস করেছিল।

পুরুষ যতই বুড়ো হয় তত বেশি ছুঁকছুঁকে হয়। যত বুড়ো ততই বিপজ্জনক। যারা স্ত্রৈণ থাকে যৌবনে, তারাই ঝৈন হয় প্রৌঢ়ত্বে।

ঝৈন কি?

রংকিনী জিগ্গেস করেছিল।

স্ত্রীতে যে আসক্ত সে যদি স্ত্রৈন হয়, তবে ঝি-তে আসক্ত যে, সে ঝৈন হবে না কেন?

এবার একটা বাংলা ব্যাকরণের বই লেখ তুই।

রংকিনী বলেছিল।

অস্বস্তি তো হয়ই। কিন্তু মানুষটিকে ইতিমধ্যেই খুবই ভাল লেগে গেছে রংকিনীর। এমন রোম্যান্টিকতা কোনও-বয়সী পুরুষেরই মধ্যে দেখেতোনিই, কখনও দেখবে বলেও ভাবেনি। তবু, উনি জাতে তো পুরুষ! বিশ্বাস কি?

চাঁদভাসি সমুদ্র দেখেছে রাতে সমুদ্রমুখি জানালার কাছে একা দাঁড়িয়ে। এরপর যখন আতরের তীব্র, বিজাতীয় এবং অনভ্যস্ত সুগন্ধে আমোদিত বিছানাটি ভরে গেছে নরম চাঁদের আলোতে তখন বিছানার উপরে জোড়াসনে বসে দুচোখ ভরে সমুদ্র দেখেছে। পল্যুশান যে কি? তা এখানের আকাশ বা বাতাস জানেই না। নির্মল, পবিত্র পরিবেশ, প্রতিবেশ। নানা শব্দ উঠেছে ঘন বনের গভীর থেকে রাতের বিভিন্ন প্রহরে। পাখি, পোকা, সরীসৃপের গা ছমছম করা আওয়াজ। বর্ষাস্নাত হাওয়াবিহীন গভীর রাতের বন থেকে এক কথাতে অপ্রকাশিতব্য এক মিষ্টি-তিক্ত-কটু-কষায় গন্ধ উঠেছে। যদিও এখন বর্ষাকাল নয়, চুমকি এবং আহুক-এর কাছে শুনেছে, বর্ষা এখানের নিত্যসঙ্গী। ক্যালেন্ডারের তোয়াক্কা না করেই সে আসে যখন তখন তার খেয়াল-খুশি মতো।

কেন যে এই সাংঘাতিক নামের দ্বীপে রয়ে গেল রংকিনী কে জানে! খাটে বসে ভাবছিল ও। কি লিখে রেখেছেন তার নিয়তি তার জন্যে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপে? এখন সেই প্যাডক গাছের ব্রহ্মদৈত্য আর গর্জন গাছের শাকচুন্নী কী করছে, কে জানে। সেই অস্ট্রেলিয়ান ফুলের গাছটিতে কি এই রাতে নিভৃতে এখন ফুল ফুটছে? ফুল ঝরছে? সাদা সাদা? সুপার্বা গ্রিনিসিডিয়াতে?

কাল সকালে আহুক বোস এর সঙ্গে দ্বীপ পরিক্রমাতে যাবে এই ভাবনাই তাকে

এক চাপা উত্তেজনাতে উত্তেজিত করে রেখেছে। কিন্তু ভাঁরাপ্পান যদি কালও না আসে? অন্তর্বাস কাল কাচতেই হবে। কোথায় শুকোতে দেবে ব্রা আর প্যান্টি? কী যে করে রংকিনী। নানা চিন্তা করতে করতে কত রাত অবধি জেগেও ছিল ও, জানে না। যেই মনে করেছে এমন সমুদ্র মেখলা-পরা একটি আদিম অরণ্যসঙ্কুল ছোট্ট দ্বীপে সে একা এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, ওর নিজেকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এ কি স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? কী করে পারল ও এমন অঘটন ঘটাতে? সমাজ জানলে কী বলবে? ছিঃ! ছিঃ! সমাজ কি বিশ্বাস করবে যে ...

আঙ্কল বলছিলেন, এই দ্বীপে ইগুয়ানো আছে অনেক। কালকে দুটি শিকার করে খাওয়াবেন। কী দিয়ে শিকার করবেন তা কে জানে। একটা ছবি দেখেছিল রংকিনী বহুদিন আগে এলিজাবেথ টেইলর আর রিচার্ড বার্টনের। ছবিটির নাম ছিল "দ্যা নাইট অফ দ্যা ইগুয়ানো"। আরও একটি ছবি দেখেছিল ওঁদেরই। তার নাম ছিল 'দ্যা স্যান্ডপাইপার্স'। এখানে নাকি অনেক স্যান্ডপাইপার্স পাখিও আছে। সমুদ্রতটেই সে পাখিরা থাকে। কার্লু। সি-ঈগল। সেদিন বে-আইল্যান্ড হোটেলের বারান্দার মতো ড্রয়িংরুমে বসে যে বড় পাখি দুটোকে দেখেছিল ওরা সেগুলোর নাম না কি "হোয়াইট বেলিড সি-ঈগল"? সত্যি! মানুষটা অনেকই জানেন। কিন্তু কেবলি বলেন যে আমি তো উ্যনিভার্সিটিতে যাইনি। কোনও ডিগ্রি পাইনি। আমি তো সর্বার্থেই অশিক্ষিত।

উনি যদি অশিক্ষিত হন তবে শিক্ষিত কাকে বলবে ভেবে পায় না ও। রংকিনীর বাবা বলতেন "THE PURPOSE OF A UNIVERSITY IS TO BRING THE HORSE NEAR THE WATER AND TO MAKE IT THIRSTY." এই তৃষা কারও কারও হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে না গেলেও থাকে। অধিকাংশরই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেও সে তৃষা জন্মায় না।

৭
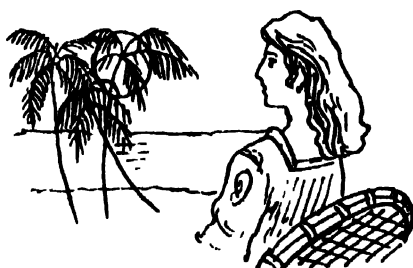
এই ভাবনাটি আগে কখনওই মনে আসেনি আহুক বোস এর। এ এক বিধুর বিরহের বোধ। আসছে কিছুদিন হল, ফিরে ফিরেই।

মানুষটি তাঁর নামেরই মতো। অসাধারণ নন। তবে অবশ্যই অন্যরকম। অন্যরকম অবশ্যই। তা নইলে সমুদ্রঘেরা এই ছোট্ট দ্বীপে ছ'বছর একা আছেন কী করে!

"দ্যা হর্নেস্ট নেস্ট" আইল্যান্ডের পুবের আকাশে আর সমুদ্রে এখন আলোর আভাস ফুটছে। কোনওদিন চাঁদকে সাক্ষী রেখেই পূবালি বাতাস পাখিদের জাগাতে জাগাতে দ্বীপে আসে, বড় ভালবেসে আসে, কোনওদিন বা সাক্ষীহীন। এই সুন্দর সমুদ্রমেখলা-ঘেরা দ্বীপ এবং এই নিতুই-নব সমুদ্রকে, প্রাচীন, আদিম সব প্যাডক গাছেদের ঘনসন্নিবিষ্ট বনের গভীর রহস্য, প্যারাকিটদের চাবুকের মতো ডাকে যখন ফুটন্ত আলোতে দ্রবীভূত না হয়ে আরও ঘনীভূত হয়, তখন আহুক নিজের আস্তানা ছেড়ে দ্বীপের শেষ প্রান্ত অবধি হেঁটে গিয়ে পুবে চেয়ে সূর্যকে স্বাগত জানান।

না, না সূর্যপ্রণাম-ট্রণাম করেন না তিনি। কোনওদিনও করেননি। প্রণম্য কোনও কিছুর সংস্পর্শেও আসেননি এখনও। না কোনও মানুষ, না কোনও দেব-দেবতা। তবে, তাঁর হৃদয়ে যে ভুবনেশ্বর এবং হৃদয়েশ্বর বাস করেন তাঁর কাছে সদাই মাথা নোয়ান, মনে মনে।

কোরান, সব ইসলাম ধর্মবলম্বীকে শিখিয়েছে যে, আল্লার কাছে ছাড়া আর অন্য কারো কাছেই মাথা নোয়াবে না কখনও। আহুক তাঁর নিজস্ব অদেখা কিন্তু সদানুভূত ঈশ্বর, বা হৃদয়েশ্বর বা ভুবনেশ্বর ছাড়া এজীবনে কারো কাছেই মাথা নোয়াননি। আশা রাখেন তিনি যে, যতদিন প্রাণ আছে, নোয়াবেন না।

সেলুলার জেল শুধু আন্দামানেই নেই, বন্দীরা শুধু সেখানেই অত্যাচারিত হননি নির্মমভাবে, সেই জেল আছে প্রত্যেক মানুষেরই বুকের মধ্যেও। সেই জেলে সে নিজেই বন্দি, নিজেই জেলার, নিজেই ফাঁসীর আসামী। এবং ঘাতক।

বিরহী মন, বিরহী দ্বীপ, বিরহী সমুদ্র বুকের মধ্যে কেন জানেন না, ভোরের পূবালি বাতাসের মতো মুঠো মুঠো দুঃখ বয়ে আনে। অথচ এ দুঃখ কোনও মানুষকেই ক্লিষ্ট করে না, বরং স্নিগ্ধ করে। এ দুঃখর শেষ একদিন নিশ্চয়ই হয় সব মানুষেরই জীবনে। শেষ হওয়ারই কথা। কারণ, এ অশেষ নয় বলে।

একটা সময়ে, সপ্তাহে অন্তত একবার নিজে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যেতে হত আহুক-এর। ষাটের দশকে। "বিরহী" নামের একটি জনপদকে

পেরিয়ে গেছে সে পথ। উযালগ্নে যাবার সময়েও সেই জনপদ ঘুমিয়ে থাকত, অনেক রাতে যখন ফিরতেন তখনও সে জনপদ ঘুমিয়ে থাকত। আশ্চর্য সুন্দর একটি বাঁক ছিল সেই পথটিতে বিরহীর কাছে। সেই বাঁকটি যেন বিরহী নামটিকে সার্থকতা দিত। যেখানে বাঁক নেই সেখানে তো বিরহ থাকে না!

আজকের ন্যাশানাল হাইওয়েতে সেই বাঁক নিশ্চয়ই নেই। নেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুঁকে-পড়া মহীরূহ—সরু, আঁকাবাঁকা পথের দুপাশে। নেই সেই নির্জনতা।

আহুক বোস ভাবেন যে, এই নীল সমুদ্রের মধ্যে এই লাল-মাটি সবুজ-বনের দ্বীপ, সেই দ্বীপে এমনই সুন্দর সকাল প্রতিদিনই ফিরে ফিরে আসবে, যদি না মানুষের লোভ আর অহং আর হঠকারিতা, একে অন্য অনেক সুন্দর নির্জন জায়গারই মতো, ধ্বংস করে দেয়।

প্রার্থনা করেন, সবই থাকবে। এই প্যাডক গাছের বন, চিড়িয়া টাপ্পু, ওয়ান্ডারুর থেকে শুরু হওয়া সুন্দরী ম্যাংগ্রোভ বন, জলপথের দুধারের পাহাড়ময় দ্বীপের গায়ে গায়ে বিহারের চিলবিল বা ওড়িশার গেন্ডুলি গাছেদের মতন সাদা নরম-কাঠের ধবধবে উরুর দীর্ঘাঙ্গী সব গাছে। তাদের নিম্নাঙ্গ, ঊর্ধ্বাঙ্গর চেয়ে লম্বা বেশি। নানা রঙা সবুজের সমারোহর মধ্যে তাদের গায়ের সাদা, ভারি এক বৈচিত্র্য আনে। জলি বয় দ্বীপের নীল মেখলা, প্রবালমালা, সবই থাকবে। স্কিন্‌ক দ্বীপপুঞ্জর পাঁচ বোনেরা হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের মধ্যে নীল মেখলা মেলে খেলা খেলবেই প্রতিদিনই, যখন ভাঁটা পড়বে। রঙিন মাছ খেলা-করা আর রঙিন প্রবাল-ঘেরা স্বচ্ছ অগভীর প্রায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে সমুদ্র পেরিয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে তখনও শিহরিত নববিবাহিত মানুষ-মানুষী হাতে হাত রেখে হেঁটে যাবে। থাকবে, সমুদ্রের গন্ধ, সাদা-পেটের ঈগল-দম্পতির চকিত তীক্ষ্ণ ডাক, দূরের মেগাপড দ্বীপে মেগাপড পাখিদের স্বপ্নও থাকবে। থাকবেন না শুধু আহুক নিজে।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে মাঝে মাঝেই এই সুন্দরকে ছেড়ে যেতে হবে বলে বড় বিষণ্ণ বোধ করেন আহুক। এ নার্সিসিজম নয়। নিজেকে কোনওদিনই তেমন ভালবাসেননি তিনি। আজও বাসেন না। হয়ত বাসতেন, যদি তাঁকে কেউ তেমন করে ভালবাসত। একমাত্র ভালবাসাই অন্য ভালবাসার জন্ম দিতে পারে। আনন্দই, অন্য আনন্দর।

এই প্রকৃতিকে আহুক বোস অবশ্যই ভালবাসেন। একমাত্র প্রকৃতিই এই আদিম এবং চিরকালীন সুন্দরী, তাঁর ভালবাসাকে দশ গুণ করে ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই ভালবাসা সত্যি না হলে একা এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপে তিনি থাকতে পারতেন না ছ'টি বছর।

সুখের সঙ্গে, আনন্দর সঙ্গে, ভোগ আর আরামকে নির্বিবাদে গুলিয়ে ফেলেছে আজকের এই "উন্নত" মানুষেরা। সর্বজ্ঞ হয়েছে তারা। কোমরে মোবাইল-ফোন ঝোলানো, হাতে কম্প্যুটার-ঘড়ি পরা, বস্তুবাদী আর বৈজ্ঞানিক, "উদ্ভাবনের" গর্বে

মদমত্ত, আধুনিক, উদ্ধত মানুষ তার কল্পিত কোনও অস্তিত্বহীন ধ্রুবতারার দিকে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে, পতঙ্গ যেমন আলোর দিকে ধেয়ে যায় চিরদিন মরারই জন্যে। মহাকাশের চিরদিনের নিশ্চিত নিরাপদ কোণ ছেড়ে কোনও গ্রহ বা তারা যেমন কক্ষচ্যুত হয়ে জ্বলে গিয়ে উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তেমনই এই দুর্বিনীত মানুষেরাও নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শেষ, সবকিছুরই আছে। ক্ষয় সবকিছুরই হয়। কিন্তু একজনের, একগ্রহের ক্ষয়-ক্ষতি-বিনাশ যদি অন্য জনের মনে, অন্য গ্রহের মাটিতে ফুলই না ফোটাতে পারেন, যদি নতুন কোনও পাখিই না ডাকল সেখানে, যদি ভয়নাশই না হল, তবে সেই ক্ষয় বা ক্ষতি তো বৃথাই। একের ভয় যদি অন্যের অভয় হয়েই না আসে, তবে তো সেই ভয় ভীষণা রাক্ষসীই!

এত সব এলোমেলো ভাবনা মনে সত্যিই আসে আজকাল আহুকের। কিন্তু এসব কথা বলেন কাকে? আর বললেই বা শুনবেটা কে? এই ভাবনাগুলো সমুদ্রপারের টার্ন আর স্যান্ডপাইপারদের মতন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরে ঘূর্ণী নাচন নাচতে নাচতে, সর্বনাশা, চকিত, সংক্ষিপ্ত ডাকে তাঁর মাথার মধ্যে দিন ফুটোতে ফুটোতে যখন সামুদ্রিক দিগন্তে বা ঘন সবুজ আদিম রেইন-ফরেস্টের অটল বাধার দিকে উড়ে যায়, নয়ত ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ের মতো মনের বিবাগী বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নিচু হয়ে বসে সেই সব বিন্যস্ত ভাবনার টুকরো-টাকরা কুড়িয়ে নিতে বড়ই অনীহা আসে। যা যায়, তা যায়ই, যা গেছে তা গেছেই। তাঁর অনেক ঠগী প্রেমিকাদের মতো। যারা, তাঁর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছে, তাঁকে কেউই বোঝেনি। কেই বা কাকে বোঝে?

নিজের মনে আজকে আর কোনও সংশয় বা দ্বিধা নেই। নির্জনতা ও একাকিত্ব তাঁকে অনেককিছু ফিরিয়েও দিয়েছে, যা-কিছুই তিনি হারিয়ে ছিলেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি ডেভিড থোরো, ন্যুট হামস্যুন, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সকলের কাছ থেকেই তিনি নির্জনতার আর প্রকৃত আনন্দর পাঠ নিয়েছেন। সুখের আর আলসেমির পাঠ নিয়েছেন বার্ট্রান্ড রাসেল-এর কাছ থেকে।

বেশ আছেন। সুখে আছেন। কাজ বলতে যা, তা অতি সামান্যই। জীবনে আহুক অনেকই দিন, অনেকই কাজ করেছেন। কাজকে ভয় পাননি কখনওই। এখন বাণপ্রস্থর সময়। সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে, গাছের সঙ্গে কথা বলে, মাছের সঙ্গে কথা বলে এবং বাচাল মানুষদের সঙ্গে কথা না-বলে দিন বেশ কেটে যায়।

দুঃখ শুধু একটিই! এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন। এবং সেদিনের খুব বেশি দেরিও নেই। সবই আছে, থাকবে। তাঁর কাঠের বাংলোয় তার শোওয়ার কাঠের মাচাখানি, তাঁর জুতো, চটি, তাঁর স্যুইম সুট, টোকা, তাঁর কলম, প্যাড, চশমা। শুধু তিনিই থাকবেন না। কত জনকেই তো বিদায় দিলেন আজ অবধি। বলে এলেন, যদি পরজন্ম থাকে তবে দেখা হবে। যদি স্বর্গ থাকে, তবেও।

যদি।

যদি নাই থাকে, নাই বা থাকল। আছে ভাবতে ক্ষতি কি?

জীবনের পরে আর কিছু নেই এই কথাকে নিশ্চিত করে জানলে, এতে বিশ্বাস করলে, কোনও কিছু থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত করা ভারি মুশকিল হয়ে ওঠে। তাই বোধহয়, আস্তিক ভাবেন, "আছে" ভাবাই ভাল।

আছে। আছে। আছে। সবই আছে।

ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন, প্রথম সঙ্গমের স্মৃতির মতন, তাঁর প্রথমা স্ত্রী টিটিঙ্গির সারল্য ও সততার মতন, তাঁর দ্বিতীয়া নারী, ঠগী চিচিঙ্গার শঠতার মতন, তার কল্পনার প্রেমিকার ফুটি-না-ফুটি প্রেমের মতন, স্বপ্নে-দেখা তার আগুন-পারা নগ্নতার মতন স্পৃশ্য বা দৃশ্যমান না হয়েও সবই আছে।

আছে, প্যাডক-এর ছায়াতে, বালুতটে, স্থলে,
আছে মৎসগন্ধী জলে, মাছে,
আছে, আছে, আছে
সবই আছে।

৮

ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল পরিচিত একঝাঁক পাখির তীব্র চাবুকের মতো ডাকে। তারা সারা বনে পুলক ভরে কোনও বিশেষ খবর যেন জানান দিতে দিতে তীরের মতো উড়ে গেল সেই বন-বাংলোর উপর দিয়ে।

কী খবর? কলঙ্কিনী রংকিনীর খবরই কি?

কী পাখি?

তা প্রথমে মনে পড়ল না চট করে। তারপরই মনে এল চকিতে, টিয়া! টিয়া! টিয়া! প্যারাকিট!

হয়তো ও উঠে বসে হাই তুলেছিল বা আড়মোড়া ভেঙেছিল। আহুক জানতে পেরে গেছিলেন যে রংকিনীর ঘুম ভেঙেছে। বারান্দা থেকেই গলা তুলে বললেন, ওড মর্নিং ইয়াং লেডি। শ্যাল আই ব্রিং ইওর টি দেয়ার অর উইল উ্য কাম টু দ্যা ভারান্ডা?

রংকিনী বলল, ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড।

মনে মনে বলল, এ রাতটা তো কাটল নির্বিঘ্নে।

মুখে বলল, আমিই আসছি বাইরে।

চা ভিজিয়ে দিলাম কিন্তু।

আমাকে কি কিছুই করতে দেবেন না? তারপর বাথরুমে গিয়ে খুলে-রাখা ব্রা-টা পরতে পরতে না-বলে, বলল, একটা আয়নাও নেই ছাই! তারপর চানঘরেব বাতিটার সলতে নামিয়ে দিল।

নিজেই তো বললে কাল যে ওমলেট ভাজা আর চা করা ছাড়া আর কিছুই জানো না করতে। তা ব্রেকফাস্টে ওমলেটটা না হয় ভেজো। চা-টা আমিই করে দিচ্ছি। তবে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। অনেক দূরে যেতে হবে তো। উঁচু-নিচু পাকদণ্ডী পথ, পাহাড়ে, সমুদ্রতটে। তাড়াতাড়ি করে কিছু খেয়ে নিয়েই চলো বেরিয়ে পড়ি।

আর চান?

চান তো সমুদ্রে।

কী পরে?

কিছু না-পরে। কোনও চিন্তা নেই তোমার। আজ আমি তোমাকে তেল মাখিয়ে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দেব। এমন সোহাগে তোমার মাও তোমাকে কোনওদিন চান করাননি।

হুঁ। এটাই বাকি আছে।

মুখে বলল বটে কথাকটি রংকিনী কিন্তু তার শরীরে কথাকটি রোমাঞ্চ জাগাল।

মানুষটি সত্যিই জংলি। কী যে বলেন আর কী যে বলেন না তার ঠিক নেই।

বলতে বলতে, পায়ে জুতো গলিয়ে বাইরে এলো। বাথরুম স্লিপারও তো আনেনি সঙ্গে। শোবার সময়ে দু-বিনুনি করে শুয়েছিল।

আহুক বললেন, বাঃ। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। তুমি সত্যিই ছোট্ট মেয়ে এবং ভারি সুন্দর মেয়ে। এই দু বিনুনিতে তা আরও স্পষ্ট হল।

তারপর বললেন, তোমার ক'চামচ চিনি আর কতটুকু দুধ? তুমি পাতলা লিকার পছন্দ কর? না, কড়া?

আপনি আপনার পছন্দসই করে বানিয়ে নিন তারপরে আমি আমারটা বানিয়ে নেব।

তা বললে হবে কেন ইয়াং লেডি। তুমি যে আমার অতিথি। তার উপরে আমার মালকিন এর বান্ধবী। খাতির-যত্ন ঠিকমতো না হলে যে আমার চাকরিটাই যাবে।

আপনাকে দেখে তো মনে হয় না পৃথিবীতে কারো চাকরিরই আপনি তোয়াক্কা করেন।

অন্যের চাকরির কথা জানি না। তোমার চাকরির তোয়াক্কা অবশ্যই করি। এমন চাকরি গেলে আর কি পাব এ জীবনে আর কোথাওই।

বলেই বললেন, একী! শুধু শুধু চা খাচ্ছ কেন? নারকোল কুচি দিয়ে দু'মুঠো মুড়ি দিয়ে খাও। এই যে!

মুড়ি। ওমা আপনি মুড়ি খান? মুড়ি তো ছোটলোকেরা খায়।

জানি। আমি তো ছোটলোক ভারতীয়। আর তোমরা সব বড়লোক সাহেব মেমসাহেব। তোমরা খাও "কেলগ"-এর সিরিয়ালস। দশ কেজি মুড়ির দাম দিয়ে পাঁচশো গ্রাম সিরিয়ালস। চিঁড়ের বদলে প্যাকেটের কর্নফ্লেকস। মাঝে মাঝে আমার সত্যিই সন্দেহ হয় ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বছর হল স্বাধীন হয়েছে! তোমরা পাটি-সাপটা খাও না, ভীষণ MESSY বলে। কেক খাও। কুচো নিমকি বা কড়াইশুঁটি বা ফুলকপির সিঙ্গাড়া খাও না চিকেন বা মাটন প্যাটিজ বা হ্যাম-বেকন খাও। প্রোটিন-এর জন্যে তোমরা হা-ভাতে হাড়-জিরজিরে রোগা-হাগা গরু খাও, তোমরা বাবাকে বলো "ড্যাড", মাকে বল "মাম", "নমস্কার" না বলে বলো, হাই! বাংলা ভাষা তোমাদের কাছে হিব্রু বা ল্যাটিনের চেয়েও কঠিন। তোমরাই নব্য আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়। তোমরা হিংলিশএ হেক্সপার্ট কিন্তু ইংরেজিটা শিখলে না।

তারপরেই বললেন, পৃথিবীতে এখন কোন রোগটি সবচেয়ে ভয়াবহ বলত?

হঠাৎ এই প্রশ্ন?

আহা বলোই না!

আমার বুদ্ধি এখনও ঘুমোচ্ছে। পেটে এক কাপ চাও পড়েনি যে!

তবু বল।

এইডস?

উহুঁ।

থ্যালাসেমিয়া?

উহুঁ!

তবে? কি?

আমেরিকার প্রভাব। সারা পৃথিবীটাকে ঐ একটা দেশই শেষ করে দিল। ধনে মারল, প্রাণে মারল, সংস্কৃতিতে মারল, চরিত্রে মারল, স্বভাবে মারল, ভাষাতেও মারল।

যাকগে এমন সুন্দর সকাল বেলাটা আমেরিকাকে উৎসর্গ না করলেও চলবে। অন্য কথা বলুন।

ঠিক আছে। চা খেয়েই একটা গান শোনাতে হবে। তোমার সম্বন্ধে চুমকি আমাকে সবই বলে গেছে।

কখন?

যখন ও দ্বীপ ইন্সপেকশানে গেছিল আমার সঙ্গে। তুমি তো দুপুরের খাওয়ার পরে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সত্যি। জেগে উঠে দারুণ ভয় লেগেছিল। দ্বীপে আমি একা।

তারপর বলল, চুমকি কী বলেছে তা আমি জানি না, তবে এখন আমার মোটেই গান গাইতে ইচ্ছে করছে না।

রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

পাহারাদার তো খারাপ ছিল না। ভাল ঘুম না হওয়ার তো কোনওই কারণ নেই।

আর পাহারাদারের পাহারাদার? সে কিন্তু আদৌ ভাল নেই। কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি।

কেন?

এমনিই।

এমনিই আবার কী কথা?

এমনিই। আর কথা নয়। নাও চা-টা খাও। তারপর আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।

চা-এ চুমুক দিতে দিতে রংকিনীর মনে পড়ল যে চিড়িয়া টাপুর আদিম রেইন ফরেস্টস দেখে গা-ছমছম করাতে চুমকি বলেছিল, "যাই বলিস আর তাই বলিস, ভয় না থাকলে রহস্যও থাকে না। এখানে মাংসাষী শ্বাপদ নেই, তাই ভয়ও নেই।"

ভয় না থাকলে যে রহস্যও থাকে না সে কথা কাল রাতে খুব ভাল করেই বুঝেছে রংকিনী। মাংসাষী শ্বাপদ যে সবসময় চার পেয়েই হবে এমন কোনও মানে তো নেই। দু'পেয়েও হতে পারে!

ভাবছিল, রংকিনী।

৯

কোথায় নিয়ে চললেন আমাকে? বলি দেবেন না কি? মন্দির-টন্দির আছে উপরে?

এখানে সব জায়গাতেই মন্দির, সব জায়গাতেই মসজিদ। শুধু দেখাব চোখ থাকা চাই।

ভারি উঁচু কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন।

তোমার জুতোটার জন্যে আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে। ভীরাপ্পান যদি আজ আসে তো তোমার জন্যে একজোড়া জুতো আনিয়ে নেব পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কালকেই ভোরে।

যদি আসে মানে?

মানে, যদি আসে।

নাও আসতে পারে নাকি?

আসার কথা তো ছিল গতকালই। কথার খেলাপ তো করে না ও। নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আন্দামান আর্কিপোলোগোতে একটা ভাইরাল ফিভার এসেছে। একবার পটকালে সাতদিন মিনিমাম।

কিসের ভাইরাস?

ডাক্তারেরা যে জ্বরই ডায়োগনাইজ কবতে পারেন না তারই নাম দেন ভাইরাল ফিভার। "সত্যই সেলুকাস। বিচিত্র এই দেশ।"

ডাক্তারেরা আপনার এই ব্যাখ্যার কথা কি শুনেছেন?

আমার মুখে হয়ত শোনেননি। তবে নিজেরা কি আর জানেন না? যাই বল আর তাই বল, আগেকার দিনই ভাল ছিল।

কবেকার দিন?

আরে যখন দেশের তাবৎ মানুষ মরত শুধু একটি মাত্রই রোগে।

কী রোগ তা?

সন্ন্যাস। যে-ই মারা যান না কেন, পরদিন খবরের কাগজে বেরোত "তিনি সন্ন্যাস রোগে মরিয়া গিয়াছেন।"।

জীবদ্দশাতেই ডাক্তার, প্যাথলজিস্ট, সার্জেন, ই ই জি, ই সি জি, এক্স-রে, সি টি স্ক্যান, এম আর আই ইত্যাদি ইত্যাদি করে রোগীর আর্থিক অবস্থা সন্ন্যাসীর মতো হওয়ার আগেই সন্ন্যাস রোগ স্বয়ং এসে তাকে উদ্ধার করত। রক্ষিতার বা নিজের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট স্ত্রীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গহরজান বাইজীর রেকর্ড শুনতে শুনতে আদরে-গোবরে মানুষ তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছতে পারত নিশ্চিন্তে।

ডাক্তারদের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই। বিজ্ঞানের এই দুর্দান্ত অগ্রগতির দিনে ল্যাবরেটবির ইঁদুরের মতো তাকে তিলে তিলে জীবদ্দশাতেই মরতে হতো না।

হেসে উঠল রংকিনী খুব জোরে।

বলল, বলছেন। ভালই। কিন্তু আর কত দূর?

এই তো! সামনে একটা বাঁক ঘুরলেই "দ্যা ভিউ-পয়েন্ট"-এ পৌঁছে যাব।

চুমকির মুখে শুনেছি যে জলদস্যুবা নাকি এই পাহাড়-চুড়োতে বসে দূরবীন দিয়ে মাদ্রাজ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড থেকে যাতায়াত কবা বাণিজ্য জাহাজের উপরে নজর রাখত।

চুমকি জানল কী করে?

ওর ঠাকুমাব কাছে গল্প শুনেছিল। দ্বীপটির নাম "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট" ত এই জন্যেই। এটি ছিল জলদস্যুদের আড্ডা। এর তটভূমিও আশ্চর্য সুন্দর। পাহাড়টার অবস্থান এমনই যে. কোনও দিকের হাওয়াই এসে এতে আছড়ে পড়ে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা যে এই দ্বীপে একটি মিষ্টি জলের পুকুর আছে যা কখনও শুকোয় না।

স্বাভাবিক পুকুর?

তা বলতে পারব না। হয়ত জলদস্যুরাই খুঁড়েছিল। কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে দুশো পঁয়ষট্টি দিনই বৃষ্টি হওয়াতে এই পুকুরের জল কখনও শুকোয় না। এই দ্বীপের মধ্যে একটিই অশান্তি ঘটিয়েছি আমি। একটি ডিজেল পাম্প বসিয়েছি। তবে বাংলো থেকে অনেক দূবে। যাতে, বাংলোতে বসে শব্দ না শোনা যায়। পলিথিনের পাইপ-লাইন বসিয়েছি বাংলো অবধি। ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল জমে। তুমি তো কাল রাতে সে জলেই চান করলে। তবে আমরা দুজন ঐ জলে চান করি না।

কেন?

ভয়ে। যদি যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়াতে জলে টান পড়ে যায়? এই জলই তো খাই আমরা। চমৎকার স্বাদ। তাই না? হজমও খুব ভাল হয়। খাওয়ার জল আনতে ও যেতে আসতে সাত ঘণ্টা লাগবে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। সে কি কম ঝক্কি।

তারপর বললেন, ভীরাপ্পান আবার কই আর সিঙ্গি মাছ ছেড়েছে ঐ পুকুরে। রুই কাতলাও ছেড়েছে কিছু। গরমের সময়ে কই সিঙ্গি ধরে আমার জন্যে। ও শুঁটকির ভক্ত।

আর রুই মাছ ধরেন না?

না। যেদিন চুমকি অথবা তোমার বিয়ে হবে, বরের সঙ্গে হানিমুন করতে আসবে এখানে, সেদিন পাকা লাল মাছ তুলে মাছ ভাজা, মাছের তেল ভাজা, মাছের ঝাল, দই মাছ, রেজালা, কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, মাছের মাথা দেওয়া মুগের ডাল এবং মাছের টক রাঁধা হবে। আমিই রাঁধব।

ততদিনে সব মাছ মরে যাবে। তাছাড়া, চুমকির বরের ডেভবডি কি এখানেই পড়ে থাকবে যদি সত্যিই সব পদ খাওয়ান আপনি। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

এলাম কি?

রংকিনী ঘেমে-নেয়ে বলল।

ইয়েস।

কিন্তু তুমি যে সত্যি হাঁফাচ্ছ। বসে পড় ঐ পাথরটাতে। দেখেছ! কত বড় পাথরের চাঙড়। কত জলদস্যু বসেছে এখানে, কত অপহৃতা মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে। পাথরটা কিরকম মসৃণ হয়ে গেছে দেখেছ ব্যবহারে ব্যবহারে।

মানে, ধর্ষিতা মেয়েদের পশ্চাতদেশের ঘর্ষণে পাথর ক্ষয়ে গেছে বলছেন? ব্যোপদেবের গল্পই জানতাম শুধু পাথর ক্ষয়ের, এ এক নতুন গল্প শোনালেন আপনি যা হোক! কী পাথর এটা! এই সব দ্বীপে তো পাথর বিশেষ দেখিনি, মানে পোর্ট ব্লেয়ারে, রসস্ আইল্যান্ডে, ভাইপার আইল্যান্ডে।

আহুক হেসে বললেন, না। এগুলো স্যান্ডস্টোন। বোসো। এবারে দেখো চারদিকে তাকিয়ে সত্যিই তুমি রানী কি না।

পরের ধনে পোদ্দারী করতে চাই না আমি। এমনিতেই খুশি। সত্যি! ভাবা যায় না। পৃথিবীতে এমন জায়গাও আছে!

এমন জায়গা থাকবে না কেন। হয়ত অনেকই আছে কিন্তু সেই টঙে হাজার হাজার ট্যাওরিস্ট হাঁচোর-পাঁচোর করে চড়ে ক্যাচর ম্যাচর করে সব শান্তি নষ্ট করে দেয়। এখানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই নির্জনতা। নির্জনতা তোমাকে কখনও খালি হাতে ফেরায় না। কী বনে, কী জীবনে।

রংকিনী চুপ করে রইল। এবং আশ্চর্য! 'দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এর চুড়োতে উঠে ওর পাশে, পাথরটার উপরে বসে, আহুক বোসও যেন সমাধিস্থ হলেন।

রংকিনী আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। ওর চোখ দুটি যেন প্যানোরোমিক লেন্স হয়ে গেল। তটভূমির উপরে কোথাও নারকোল গাছ ঝুঁকে পড়েছে, কোথাও অন্য নাম-না-জানা গাছ। কোথাও জলকে ছাই-রঙা দেখাচ্ছে আর তটভূমিকে গেরুয়া, কোথাও বা তটভূমিকে ছাইরঙা আর জলকে হলদেটে, জলের নিচের প্রবালের জন্যে। এক এক জায়গাতে জলের রঙ একেকরকম। বনের মধ্যে অনেক জায়গাতেই প্রকাণ্ড বড় বড় সব গাছ। কতগুলোর কাণ্ডর রঙ সাদা। প্রত্যেক বড় গাছের গায়েই লতা উঠেছে জড়িয়ে-মড়িয়ে। দিনের বেলাতেই ঘনান্ধকার সেই বনের ভিতরে। তার মধ্যে বাঘ থাকার কথা। কিন্তু আশ্চর্য! নেই। বড় শান্তি চারিদিকে। চারদিকেই হাজার মাইল সমুদ্র। বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডানে আন্দামান উপসাগর। কোথাও এতটুকু কলুষ নেই। না জলে, না হাওয়ায়, না বনে, না তটে। দু'নাক ভরে নিঃশ্বাস নিল রংকিনী। খোলা হাওয়াতে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেছে। ঘর্মাক্ত মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে খুব আরাম লাগছে।

রংকিনী ঐ বড় গাছগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আহুককে জিগ্যেস করল, ওগুলো কি গাছ?

ঐ গুলোই তো প্যাডক। এখানে বসেই সব গাছ চিনিয়ে দেব এক এক করে তোমাকে। নারকোল গাছ তো খুব বেশি নেই। অথচ চুমকির ঠাকুমা তো নারকোল বন এর দ্বীপই কিনেছিলেন, যখন কিনেছিলেন।

তা ঠিক। তবে নারকোল থেকে কোপরা করে তা কলকাতা কি মাদ্রাজে পাঠাতে যা খরচ পড়ে তাতে লোকসানই হয়। চুমকি একেবারে অন্য লাইনে চলে গেছে। ব্যবসাটাও বোঝে।

কী? মানে, কোন লাইন?

এখানে আমরা ডায়াস্কোরিয়ার চাষ শুরু করেছি। পাহাড়ের ঐ দিকের ঢাল-এ। পরে দেখাব।

ডায়াস্কোরিয়াটা কি জিনিস?

একরকমের মূল।

কী হয় তা দিয়ে?

জন্ম-নিরোধক বড়ি তৈরি হয়। চাইনিজ বেশ্যারা নাকি বহুযুগ ধরে এই মূল খায় যাতে তাদের অনভিপ্রেত গর্ভাধান না হয়।

তাই?

হ্যাঁ। এই 'দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এ ডায়াস্কোরিয়ার গাছ প্রচুর আছে।

তা ওষুধ বানাবেন কারা? চুমকিরাই?

না, না। কলকাতার দেজ মেডিক্যাল, মুম্বাই-এর সিপলা, চেন্নাই-এর প্যারি সকলের সঙ্গেই চুমকি এগ্রিমেন্ট করছে। প্রথম শিপমেন্ট কলকাতাতে পৌঁছবে নিরানব্বই-এর জানুয়ারিতে। সেখানে দেজকে দেওয়া হবে। তারপর ট্রান্সপোর্টে যাবে মুম্বাই এবং চেন্নাই।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আরও একটা দারুণ ব্যবসাতে নেমেছি আমরা। খরচ বলতে কিছুই নেই।

কিসের ব্যবসা?

পাখির বাসার।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। পাখির বাসার। এখানে অনেক রকম পাখি আছে যাদের বাসা চীনেরা আহামরি করে খায়। Edible Bird-nests। কেন? Bird-nest soups খাওনি কখনও? খেয়ে দেখবে।

চিনে রেস্তোরাঁতে?

তাজ বেঙ্গলে চেয়ো হয়ত পাবে। ওবেরয়তেও পেতে পারো। তবে বে-আইল্যান্ড-র ম্যানেজার বলছিলেন ওবেরয় গ্রান্ড নাকি নতুন থাই রেস্তোরাঁ চালু করছে। কলকাতাতে না পেলেও বম্বে-দিল্লীর বড় হোটেলে পাবে অবশ্যই।

থাই খাবার আমার দারুণ লাগে। ব্যাঙ্ককে গেলেই খাই। মুম্বাই-এর তাজ গ্রুপ-এর THE PRESIDENT হোটেলেও একটা ভাল থাই রেস্তোরাঁ আছে।

তারপর বললেন, চায়নাতে এইসব পাখির বাসার খুব ভাল দাম পাওয়া যায়। ওজনও কম। রপ্তানি করাও সম্ভব খুবই কম খরচে।

বাঃ। দারুণ বুদ্ধি তো চুমকির।

তোমারই তো বন্ধু। বুদ্ধি তো হবেই। জঙ্গল একটুও নষ্ট হল না। আবও অনেক পাখিও এল দ্বীপে।

তারপর বললেন, মিষ্টি জলের জন্যেও এই দ্বীপে গ্রীষ্মকালে পাখিব মেলা বসে যায়। আমি ওকে আইডিয়া দিয়েছিলাম এখানে বার্ড-ওয়াচিং-এর ট্যুওরিস্টদের টোপ দিতে। কিন্তু চুমকির ভীষণই আপত্তি। ও বলে, আমার দুর্দান্ত সাহসী ঠাকুমা ঠাকুর্দার সঙ্গে ঝগড়া হলে ওই 'হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এ এসে "গোসাঘর" বানিয়ে থাকতেন। তাঁর নারায়ণ আসত এখানে, রাঁধুনি, আয়া, তেলমালিশ করার মেয়েটি। ঠাকুমা নাকি বলতেন যে, এটি হয় "ভালবাসার ঘর" হয়ে থাকবে নয়তো "গোসাঘর"। এই দ্বীপকে নষ্ট করা চলবে না।

চুমকি আরও পয়সা দিয়ে করবেটাই বা কি? খাবে কে ওর পয়সা? দশ জীবনেও তো শেষ করতে পারবে না, যা আছে।

রংকিনী বলল।

পয়সার জন্যে শিল্পপতিরা নতুন নতুন আয়ের পথ খোঁজেন না। "Lack of expansion means decay." সবসময়ে তুমি যদি তোমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করাব চেষ্টাতে না থাকো, তবে সে সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে বাধ্য। সংকুচিত হতে হতে একদিন তা আর থাকেই না। বাঙালিরা এই জিনিসটা বোঝে না। কিন্তু চুমকি বোঝে। আ গ্রেট গার্ল। শি ইজ রিমার্কেবল ফর হার এজ। আমি তো বিদেশেও অনেক মহিলা আন্ত্রোপ্রানর দেখেছি। সী রিয়্যালি ইজ গ্রেট।

এই অবধি বলেই, হঠাৎ আহুক চেঁচিয়ে উঠলেন, নড়ো না। একটুও রংকি। সিট স্টিল।

রংকিনী কিছুই না বুঝে চমকে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

কিছু বোঝার আগেই গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক পালটি খেয়ে পড়ল বিরাট একটা হলদে-সবুজ সাপ। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গুলি করলেন আহুক। তাঁর কোমরে যে ওটা বেল্ট-এর সঙ্গে বাঁধা ছিল তা বুঝতেই পারেনি রংকিনী।

অনেকক্ষণ পরে শান্ত হল সাপটা। তার আগে লণ্ডভণ্ড করল পুরো জায়গাটাকে, লতা পাতা ঘাস মাটি সবের উপরে যেন ঝড় বয়ে গেল। তখন যেন মনে পড়ল রংকিনীর যে আহুক তাকে চেঁচিয়ে সাবধান করার আগে একটা জোর সড়সড় আওয়াজ শুনেছিল কিন্তু কিসের আওয়াজ তা বুঝতে পারেনি।

বুকে হাত ছুঁইয়ে রংকিনী বলল, বাঃ বাঃ। আমার বুক এখনও ধড়ফড় করছে। কি সাপ ওটা? বিষ ছিল?

বিষ ছিল মানে? শঙ্খচূড়। কামড়ালে ওয়েলার ঘোড়া মরে যায়, বনের বড় বাঘ মরে যায়। তারপর বললেন, ভীরাপ্পানটা খুব খুশি হবে।

কেন?

এই সাপটাকে ওর ভীষণই ভয় ছিল।

চেনা সাপ নাকি আপনাদের? ভাল বন্ধু-বান্ধবী নিয়েই থাকেন দেখছি। প্রেমিকা মাছ, বন্ধু সাপ।

হ্যাঁ। তবে সাপটা বন্ধু ছিল না, শত্রু ছিল। ভীরাপ্পান বলে, এই সাপটাও আসলে একটা পেত্নী। একটি অপরূপ সুন্দরী কুমারী থাই মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল নাকি এই দ্বীপে আরাকানী জলদস্যুদের দ্বারা। এই পাথরেরই উপরে। এবং এখানেই সে নাকি মারা যায়। তারই আত্মা এই সাপটি।

এই সাপের তো তাহলে বয়সের গাছ-পাথর নেই। তাছাড়া ভীরাপ্পান তো আরাকানী নয়। বিশুদ্ধ বুল-শিট। গগনভেদী গুল।

হাসতে হাসতে বলল, রংকিনী।

তারপর বলল, সাপটার বয়স কত বছর? তিনশো?

কে বলতে পারে? তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। এ গল্প তো ভীরাপ্পান বানায়নি। একজন আন্দামানীকে নিয়ে এসেছিল তিন বছর আগে, পাখির বাসা সব যাতে তার কাছ থেকে চিনে নিতে পারে, সে জন্যে। বুড়ো ছিল ওখানে দিন পনেরো আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে। থাকত ভীরাপ্পানের সঙ্গেই আর কষে শুঁটকি খেত। সেই বুড়োই বংশ পরম্পরাতে এই কাহিনী শুনেছে। রূপকথার গায়ে বয়সের মালিন্য লাগে না যে!

তাই?

ভীরাপ্পান এলে শুনো তুমি তার কাছেই।

সে আর এসেছে!

আসবে। আসবে। আর না এলেই বা কি?

বেশ লোক যা হোক আপনি।

'ভাল লোক' যে, তেমন দাবি তো করিনি কখনও। করেছি কি?

রংকিনী চুপ করে রইল।

এখন দেখো গাছগুলো। তখন যে জিগ্যেস করছিলে।

হ্যাঁ।

আমাদের এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সবশুদ্ধ প্রায় দুশো প্রজাতির গাছ আছে। তার মধ্যে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ রকমের পরিচর্যা করা হয়। তার মধ্যে আবার উনত্রিশ-ত্রিশ রকমের গাছ যা শিল্পে বা বাণিজ্যে লাগে। চুমকির এই ছোট্ট "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট", এর মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ রকম গাছ আছে। অভাবনীয়। তাই না?

হবে। রংকিনী বলল। আমি তো আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি না, বটানিস্টও নই। অত তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে আমি কী করব! মোটামুটি কটি গাছ চিনিয়ে দিন না আমাকে।

এই মোটামুটি আর ভোটাভুটি সমার্থক। এই দুই শব্দই অর্থহীন। আশ্চর্য! আমরা ভারতীয়রাই এইরকম অপার ঔৎসুক্যহীন। একজন অশিক্ষিত ইংরেজ বা জার্মান পুলিশ বা মিলিটারির নিচুতলার অফিসারেরও তীব্র ঔৎসুক্য দেখেছি তার পরিবেশ ও প্রতিবেশের গাছগাছালি, পাখ-পাখালি এবং মানুষজনের সম্বন্ধে। অথচ তুমি একজন গড়পড়তা উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়কে, (তিনি হয়ত নামী অর্থনীতিবিদ, বা দামি এঞ্জিনিয়র বা প্রগাঢ় পণ্ডিত ইতিহাসের অধ্যাপকও হতে পারেন অথবা অনেক পুরস্কার পাওয়া গুমোর-ভরা সাহিত্যিক) জিগ্যেস করে দেখো, এটা কি গাছ? সম্ভবত জবাব পাবে, গাছ। এটা কি পাখি? জবাব পাবে, পাখি। ছোট কোনও নদী দেখিয়ে প্রশ্ন করো (সেই নদী হয়ত তিনি গড়ে দিনে দশবার গাড়িতে বা হেঁটে পারাপার করছেন) কি নাম? জবাব পাবে, নদী। সবাই যে ওরকম তা বলছি না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, থাকে। নিজভূমে কিন্তু অধিকাংশেই ওরকম। বুঝলে রংকিনী, ডিগ্রি আর শিক্ষা, পেশাগত যোগ্যতা আর সাধারণ জ্ঞান এসবের মধ্যে আমাদের দেশে কোনও সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হয়।

হবে। তবে আপনি বড় জ্ঞান দেন। এখন বলুন যা জানতে চেয়েছিলাম।

এখানে চিরহরিৎ গাছ আছে অনেক। আবার পর্ণমোচীও আছে।

পর্ণমোচীটা আবার কি জিনিস? কোনও বিশেষ রকম মোচা? অথবা মুচী?

হায় ঈশ্বর! ডিসিডুয়াস বললে বুঝবে কি মেমসাহেব?

হ্যাঁ।

লজ্জার কথা। বাংলা শব্দটি জানো না, ইংরেজি বললে বোঝো।

তারপর বলুন। নো-জ্ঞান।

যে গাছেরা প্রতি বছরই পাতা খসিয়ে, মানে, মোচন করে আবারও নতুন পাতা, গজিয়ে নিয়ে নিজেদের নবীকৃত করে, তাদের বলে পর্ণমোচী। এখানে নারকোল, বা সেগুন গাছ কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে এনে লাগানো। স্থানীয় নয়। স্থানীয় গাছের ভিতরে চিরহরিৎ প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে আগে যে নাম দুটি করতে হয়, তা প্যাডক আর গুর্জন-এর। ঐ দেখো, ঐগুলো প্যাডক।

কত বয়স হবে ওগুলোর?

তা আমার প্রপিতামহর চেয়ে বেশি বই কম তো নয়। আর ঐ দেখো, ঐগুলো গুর্জন। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো-ছিটানো। তবে আন্দামানে দ্বীপপুঞ্জে চিরহরিৎ এর চেয়ে পর্ণমোচীদের রবরবাই বেশি।

কী কী পর্ণমোচী গাছ আছে এখানে?

বাদাম। ঐ যে, নিচের দিকে, দেখছ? ঐ যে পাখিগুলো উড়ে গেল যে গাছগুলোর উপর দিয়ে দল বেঁধে ...

ওগুলো কি পাখি?

পুঁটকে পুঁটকে পাখি। কালো পিঠ সাদা বুকের। ছেলেবেলায়, থুড়ি মেয়েবেলায়,

আমাদের চন্দননগরের গঙ্গাপাড়ের বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যের মস্ত বড় নিমগাছের চারদিকে এইরকমই পাখির মস্ত মস্ত ঝাঁকেরা গ্রীষ্মের বিকেলে ঘুরে ঘুরে উড়ত আর ডাকত। মা বলতেন, দ্যাখ দ্যাখ চাতক পাখি। ওরা ডাকছে 'ফটিক জল'। 'ফটিক জল'।

বাঃ। আহুক বললেন।

তারপর বললেন যে পাখিগুলোকে দেখলে তাদের নাম ইন্ডিয়ান স্যাইফ্টলেট। ঘাস, শ্যাওলা পালক আর থুথু মিশিয়ে এরা তাদের বাসা বানায়। আরও একরকমের এডিবল নেস্টস বানানো পাখি দেখা যায় আন্দামানে তবে 'দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এ সে পাখি নেই। সেই অন্য পাখিরা বাসা বাঁধে উঁচু পাহাড়ের গুহা বা গর্তে। "এই হর্ণেট্‌স নেস্ট এ" যারা আছে তাদের নাম ইন্ডিয়ান স্যাইফ্টলেট। অগণ্যই আছে। আকাশে যখন একসঙ্গে ওড়ে বগারি পাখির মতো মনে হয় মেঘখণ্ডই দমকা হাওয়াতে ভেসে যাচ্ছে বুঝি। এরা আবার কিছু নীড় বানায় শুধুই এদের লালা দিয়ে। যেগুলোর কদরই বেশি, খাবার হিসেবে, বিশেষ করে চীনেদের কাছে।

কখন বাসা বানায় এরা?

মার্চ থেকে জুন মাস অবধি। চার মাস থাকে বাসা। যে সব গাছে এরা বাসা বাঁধে, যে যে ফুল-ফল পাতা এরা খেতে ভালবাসে, সেই সবের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছি আমরা। যাতে ধীরে ধীরে "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"কে আমরা দ্যা "স্যাইফ্টলেটস নেস্ট" করে তুলতে পারি একদিন, এই পাখিদের কলোনি এবং অভয়ারণ্য হিসেবে।

স্যাইফ্‌ট নামের পাখির কথা তো জানি। এদের নাম তো বললেন স্যাইফ্টলেট।

হ্যাঁ। Star আর Starlet এর মতোই Swift আর Swiflt Let। তুমিই তো বললে, এরা পুঁচকে পুঁচকে।

হেসে ফেলল রংকিনী। বলল, বুঝলাম।

তারপর বলল, এটা কি গাছ?

ওটা বাদাম। তার মানে বাদাম ভাজার বাদাম নয়। HARDWOOD। আরও Hard-wood আছে। দেখো, সাদা চুগলাস, টঙ্গপীন, লাল ধুপ, সমুদ্র-মওহা। আরও নানারকম হার্ডউড আছে তবে 'হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এ নেই।

মওহা মানে? মহুয়া।

তাই হবে। এখানে উচ্চারণ বদলে গেছে হয়ত। তবে ঐ গাছ আমি নিজে দেখিনি। দেখতে মহুয়ার মতো কি না তাও বলতে পারব না।

আর ঐ দেখো, Soft Wood। সাদা ধুপ, বাকোটা, ডিড়ু। শিমুলের নাম এখানে ডিড়ু। পপিতা। আর ঐ দেখো লম্বাপাত্তি। দারুণ দেখতে না পাতাগুলো? উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এইরকম গাছ আছে, হাতিরা তাদের পাতা ভালবেসে খায়।

এখানে ORNAMENTAL WOOD-এর গাছও আছে কিন্তু।

কাঠও আবার ORNAMENTAL হয় নাকি?

হয়। হয়। মেমসাহেব, এখানে সবই হয়।

হয়? না হওয়ান আপনি।

না, না এরা সব এমনি হয়। আমি যা হওয়াই বা হওয়াব সেসব অন্য হওয়া।

বুঝেছি। তা চিনিয়ে দিন ORNAMENTAL WOOD গুলোকে। মানে, গাছগুলোকে।

সবচেয়ে আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপটি ছোট হলে কি হয় এখানে আন্দামানে যতরকম ORNAMENTAL WOOD দেখা যায় তার সবই আছে। এটা একটা দারুণ ব্যাপার, তাই নয়।

বলেই আঙ্কল বললেন, ঐ দেখো উত্তরে, তাকাও ভাল করে, আমার আঙুল দেখো। দেখেছ, সুন্দর রুপোলি-ছাই রঙা গাছটি। কাণ্ডর একাংশর রঙ। এদের নামই SILVER GREY। আমার মাছ-প্রেমিকা টুনা, টুনির মতো এর গায়ের রঙ। আর ঐ পুবের ঢালে দেখো SATIN WOOD। আমার মাছ-প্রেমিকার তলপেটের মতো পেলব, মসৃণ। আর দক্ষিণে দেখো MARBLE WOOD। আর ঐ গাছটার নাম কি বলতে পারো? বলতে গেলে একেবারে তোমার মাথার উপরে যে ছাতা ধরে আছে।

বাঃ রে! আমি কি করে বলব?

এর নাম চুল।

কি? আবারও গুল!

সত্যি বলছি। এটাও ORNAMENTAL গাছ। বিশ্বাস না হলে এর BOTANICAL নাম শুদ্ধু বলে দিতে পারি।

কি?

Sageraca Eliptics।

এই অর্নামেন্টাল গাছগুলো বিক্রি করে তো আপনাদের খুব লাভ হয় তাই না? রংকিনী বলল।

বিক্রি করলে অবশ্যই হতো। শুধু এগুলোই বা কেন? প্যাডক, গুর্জন এবং অন্যান্য গাছের কাঠের দামও তো কিছু কম নয়। কলকাতাতে ফিরে যাবার আগে চ্যাথাম আইল্যান্ডে গিয়ে দেখে নিয়ো সরকারি SAWMILL। তবে সেখানে গাছেদের এই সুন্দর নয়নমোহন রূপ তো দেখতে পাবে না। সব উলঙ্গ, ধর্ষিতা তারা সেখানে। চিরে ফালা-ফালা করা। ঐ জন্যে আমি এখানে পাঁচ বছর আসা সত্ত্বেও একবারও যাইনি চ্যাথাম আইল্যান্ডে। গাছেদের মর্গ-এ কি যেতে ইচ্ছে করে কারও? যারা প্রকৃতিকে ভালবাসে?

বিক্রি করেন না আপনারা?

নাঃ।

কেন?

চুমকির ঠাকুমা, দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট-এর ওরিজিনাল মালকিন-এর মানা ছিল! উনি যখন এই দ্বীপ কিনেছিলেন দেড় লাখ টাকাতে, উনিশশো বত্রিশ-এ তখন তাঁর বয়স

ছিল মাত্র ছাব্বিশ। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ। যেমন বিদূষী, তেমন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না। তখন দেড় লাখ টাকার মূল্যও ছিল অনেক। ইনকাম ট্যাক্স ছিল না তো! মানুষ মনের সুখে ছিল।

ছিল না ইনকাম ট্যাক্স?

ছিল কোথায়? ইংরেজদের ইনকাম ট্যাক্স আইনত প্রথম আসে এদেশে উনিশশো তেত্রিশে।

তাই বুঝি? ইস্‌স। তার আগে যদি জন্মাতাম।

আর উনি মারা গেছেন উনিশশো পঁচানব্বুই-এর কালিপুজোর দিন। অষ্টআশী বছর বয়সে। সধবা।

আহা ভাগ্যবতী মহিলা। সতীলক্ষ্মী।

কেন?

বাঃ দীপাবলীর দিনে গেলেন তো ভাগ্যবতী নন! আপনি দেখি কিসসুই জানেন না।

বাবা। এদিকে মেমসাহেব আর ওদিকে দেখি ...।

তারপরেই আত্তক বললেন, অশ্লেষা, মঘা এসবও মানো নাকি? খনার বচনও? নীলের উপোস করো?

তা করতে হয় বইকী মায়ের জন্য।

আচ্ছা প্যারাডক্স যা হোক তোমরা, এই নব্যযুগের মেয়েরা। ভাবা যায় না। দু-নৌকোয় পা তোমাদের।

তারপর? বলুন।

রংকিনী বলল।

তা চুমকির ঠাকুমা নাকি বলে গেছিলেন যে নিজেদের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেটুকু ছাড়া একটা গাছও কাটা চলবে না। লাগানো চলবে, কিন্তু কাটা চলবে না। ফলে দ্বীপটার অবস্থা দেখছ না? সবুজে-সবুজ ফুল-ফলন্ত, জঙ্গলমে-মঙ্গল, শান্তির নীড়। শুধু ডায়াস্কোরিয়ার জন্য যতটুকু জঙ্গল সাফাই করতে হয়েছে ব্যস। "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এর অবস্থা আমার দাড়িরই মতো।

মানে?

আমারও আয়না নেই, "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট" এরও আয়না নেই। নিজের নিজের চেহারা দেখতে পেলে দুজনে হাত ধরাধরি করে ডুবে মরতাম।

দুজনে মানে?

মানে এই জংলি আমি আর এই জংলা-দ্বীপ।

তাই বলুন।

এই ডায়াস্কোরিয়ার কথা তো আগে শুনিনি। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে তার সঙ্গেও ক'দিন আগেই প্লেনে দেখা, সিঙ্গাপুরে যাচ্ছিল। অনেক গল্প হল। কোন কোন

প্লান্ট বা হার্ব থেকে কন্ট্রাসেপশানের জন্যে পিল তৈরি হয় তা বলছিল ও কিন্তু তার মধ্যে ডায়াস্কোরিয়া বলে কিছুর নামতো যে উল্লেখ সে করল না।

সাম্প্রতিক অতীতে হয়ত আবিষ্কৃত হয়েছে। না হলে কলকাতার দেজ মেডিক্যাল, মুম্বাই-এর সিপলা বা চেন্নাই-এর প্যারি রাই বা নিতে রাজি হবে কেন?

তা নিক। ডায়াস্কোরিয়া বানানটা কি?

DIOSCOREA। উচ্চারণ ডিওসকোরিয়াও হতে পারে। ডিকশানারিতে শব্দটা থাকলে উচ্চারণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেত।

ঠিক আছে। কলকাতা ফিরে ওকে একটা ফ্যাক্স পাঠাব বাঙ্গালোরে জানতে চেয়ে। কে জানে! এও হয়ত আপনার আরেক গুল।

১০

দুপুরে আবার ঘনঘটা করে মেঘ সাজল। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ গুমোট। কিন্তু এই দ্বীপে গরম নেই।

আহুক কিচেনে রান্না করছিলেন। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। রংকিনীকে কিচেনে ঢুকতেই দিলেন না একবারও কাল থেকে। ইগুয়ানো-টিগুয়ানো যে মারেননি, ভালই হয়েছে। ও খেতেও পারত না। বমি করেই দিত হয়ত। একবার সিঙ্গাপুরে এক ক্লায়েন্ট সবচেয়ে এক্সপেনসিভ রেস্তোরাঁতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত বাঁদরের ঘিলু খাইয়েছিল। চাকালাগানো রুপোর একটি খাঁচাতে করে বাঁদরটাকে টেবল-এর পাশে নিয়ে এসে রুপোর হাতুড়ি দিয়ে তার মাথার খুলিটা টুক করে ফাটিয়ে তারপর তালুর একটি পাশ উঠিয়ে রুপোর চামচে করে ঘিলু তুলে একটি রেকাবী মত রুপোর পাতে রাখল। আর তা খেতে হয়েছিল নিট কনিয়াক-এর সঙ্গে। ফ্রেঞ্চ ভি. এস. ও. পি.।

মানুষের ধারণা যে, যেসব মেয়েরা চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের একমাত্র বিপদ আসে বহু পুরনো ও চিরচেনা একটিই সূত্র থেকে। কিন্তু মেয়েদের যে হাজার রকম অন্য বিপদেও পড়তে হয় তা খুব কম মানুষেই জানেন। বাঁদরটা চিঁচিঁ করছিল। এখনও মাঝে মাঝে সেই করুণ মৃত্যু-চিৎকার যেন শুনতে পায় রংকিনী। এক চামচ মুখে দিয়ে গিলে ফেলেই হাসি হাসি মুখে বাথরুমে গিয়ে বমি করেছিল।

খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ক্লায়েন্ট। তাকে অসন্তুষ্ট তো করা যায় না।

আহুক রান্নাঘর থেকে বললেন, গন্ধটা কেমন ছেড়েছে বলত? কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর চচ্চড়িও করব। আন্দামানী চালের ভাত দিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খাবে। কিন্তু তুমি রান্না কিছু না করতে পারো একটা বর্ষার গানতো করতে পারো।

ডিসেম্বরে বর্ষার গান?

আকাশের মেঘ বড়, না ক্যালেন্ডার বড়? গাও না!

আপনি গান জানেন?

না। তবে শুনতে খুব ভালবাসি। যারা গান জানে তাদের ঈর্ষা করি। গীতবিতানের প্রত্যেকটি গানের বাণীই আমার মুখস্ত। কিন্তু বিধাতা গলাতে সুর দেননি। এ যে কী কষ্ট কী বলব।

আমি যা জানি তাকে গান জানা বলে না।

আগেকার দিনই ভাল ছিল।

আহুক বললেন।

কেন, একথা?

তখন প্রত্যেক কুমারী মেয়েকেই অন্তত গোটা ছয়েক গান শিখে রাখতেই হতো, পাড়া প্রতিবেশী তাতে তিতি বিরক্ত হলেও।

কেন?

বাঃ। বরপক্ষ মেয়ে দেখতে এলে, গান ওজ আ মাস্ট। বড়লোক-গরিবলোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত কারোই ছাড় ছিল না। মেয়ে অথচ গান গাইতে জানে না এতো একেবারে অভাবনীয় ছিল সেই সময়ে। বড়লোকের মেয়েরা অর্গান বাজিয়ে কাননবালা দেবীর স্টাইলে দু-বিনুনী ঝুলিয়ে ছোটহাতা ব্লাউজ পরে গাইত "ঐ মালতীলতা দোলে, পিয়াল তরুর কোলে কোলে।"

সফিস্টিকেটেড হলে, গাইত রবীন্দ্রনাথের পূজার গান অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত। নিম্নবিত্ত বা অল্প শিক্ষিত হলে, মেঝেতে মাদুর পেতে, কনে-দেখা আলোতে পাড়াতুতো বৌদির সিঙ্গল-রিড এর, সিঙ্গল স্কেল-এর হারমনিয়ম-এ হিমাংশু দত্তের "ছিল চাঁদ মেঘের পারে-এ-এ-এ" অথবা নজরুল-এর "সখী জাগো, রজনী পোহায, মলিন কামিনী ফুল, যামিনী গলায়" গাইতে হতো। নইলে বিয়েই হতো না।

আমাদের তো বিয়ে এমনিতেই হয়নি। থুড়ি, আমরা বিয়ে করিনি। এখন দিন পাল্টে গেছে স্যার। এখন মেয়েপক্ষই ছেলে দেখতে যায়। ছেলে আপনার মতো ভাল রান্না করতে পাবে কি না, ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতো মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে পিস্তল "পুল" করে শঙ্খচূড়রূপী থাইল্যান্ডের পেত্নীর স্পর্ধিত মাথা ভূলুণ্ঠিত করতে পারে কিনা, দুর্গম, বুক-হিম করা সমুদ্রমেখলা নির্জন দ্বীপে এক অচেনা যুবতীর ঘুম নির্বিঘ্নে করতে পারে কিনা, তাকে কিছুই না-পরে থাকার লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারে কি না ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। পাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে কি না, নাচ জানে কি না, পাত্রীর সঙ্গে কলকাতার ওবেরয় গ্রান্ড-এর "PINK ELEPHANT" বা তাজ বেঙ্গলের "INCOGNITO"-তে সুছন্দে ব্রেক-ডান্স বা সুন্টুনি-মুন্টুনি খিচুং-পিচুং নাচ নাচতে পারে কি না, এসবেরও পরীক্ষা দিতে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানলেও সে গান যেন পীযূষকান্তি সরকারের গানের মতো গিমিকসর্বস্ব, ঠমকময় বুকনি-বাটা গান না হয়, এত সব শর্ত পালন করতে হবে। আজকাল ছেলেদের বিয়ে হওয়া অত সোজা কথা নয়। ঘরে ঘরে অরক্ষণীয় ছেলে দেখা যায় আজকাল। THE TABLE IS TURNED SIR. পুরুষেরা অনেকদিন মেয়েদের হরেকরকম অপমান করে এসেছে। "চুলটা খোলোতো মা, একটু হেঁটে দেখাও তো মা, দেখি, তুমি খোঁড়া কি না, কখনও কখনও পাত্রীর বুকেও হাত দিয়ে পরখ করেছে পাত্রর ট্যারা-পিসীমা বা খোনা-জ্যেঠিমা, মেয়ের বুকটা সত্যি, নাকি ন্যাকড়ার পুঁটলি বা রাবারের দলা গোঁজা। কী অপমান! কী অপমান! ঐ সমস্ত অপমানেরই শোধ তোলবার সময় এসেছে এখন। হাঃ হাঃ।

খুব জোরে হেসে উঠলেন আত্তক। বললেন, তা তোলো শোধ। এত সুযোগ সত্ত্বেও আজ অবধি তুমি বা চুমকি বিয়ে করার মতো এমন একটা সোজা কাজও করে উঠতে পারলে না।

তারপরে বললেন, যাক গে। গাওতো এবারে একখানি গান।

রংকিনী বলল, ইচ্ছে করছে না এখন। রাতে শোনাব। লজ্জা করছে। গায়িকা তো নই!

আমার মায়ের গানেব খাতাতে এক রসিক ভদ্রলোক লিখে দিয়েছিলেন "লজ্জা নারীর ভূষণ অবশ্যই কিন্তু গানের বেলা নহে।" তবে সেসব লজ্জাশীলা নাবী, সেই যুগের নারী।

বলেই, আবারও হেসে উঠলেন আহুক।

রংকিনী বলল, বাঃ। কিন্তু আজকালকার আমরা কি নির্লজ্জ?

জানো ম্যাডাম, "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এর এই পর্ণকুটিরে একটিও আয়না যে কেন রাখিনি তা ভেবে সত্যিই আপসোস হচ্ছে।

কেন?

তোমাকে এই পোশাকে কেমন যে লাগছে তা তুমি নিজে তো দেখতে পারলে না। ভীরাপ্পানটা যদি আজও না আসে তবে সে মুখপোড়াও এই বিনি পয়সার অদ্ভুত দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

রংকিনী হাসল। বলল, আয়না থাকলে, আমার অস্বস্তিটা পরিপূর্ণ হতো। তাই তো এতো উৎসাহ? আয়না না থাকায় অসুবিধা হচ্ছিল অবশ্যই কিন্তু এখন মনে করছি, আয়না না থাকাতে বেঁচেই গেছি।

রংকিনী দ্বীপ ঘুরে খেয়েনেয়ে ফিরে এসে চানঘরে চান করার সময়ে আন্ডার-গার্মেন্টস এবং সালোয়ার-কামিজ সব আহুক-এর দেওয়া গুঁড়ো সাবান দিয়ে কেচে একটু দূরের একটি ঝাঁকড়া গাছের আড়ালের নাম না জানা ঝোপ-এর উপরে মেলে দিয়েছে, যাতে রোদ পড়ে, এমন জায়গা দেখে। এখন মেঘ সরলে বাঁচে। পুরুষদের চোখের সামনে অন্তর্বাস শুকোতে দিতে বড় লজ্জা করে। কে জানে কেন! এখনও এসব সংস্কারমুক্ত কেন যে হতে পারেনি। তাদের আন্ডারওয়্যার, লাল-নীল ল্যাঙ্গোট, চেক-চেক লুঙ্গি, বুক-কাটা গেঞ্জি এসব মেয়েদের চোখের সামনে শুকোতে দিতে পুরুষদের লজ্জা না করলে ওদেরই বা অন্তর্বাস শুকোতে দিতে লজ্জা করবে কেন?

আহুক এর একটি টাইট সাদা টেরিকট-এর শর্টস রংকিনীর বারমুডা হয়ে গেছে। ফ্রেড-পেরির একটা সবুজ-রঙা গেঞ্জিও অভাবনীয়ভাবে ফিট করে গেছে। যদিও লম্বাতে প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। ভাগ্যিস একজন ছিপছিপে কিন্তু ভাল ফিগারের মেয়ের বুকের মাপ আর স্বাস্থ্যবান পুরুষের বুকের মাপ একই হয়!

দুটি পায়ে গলিয়েছে আহুকেরই একজোড়া বাথরুম স্লিপার। সবুজ-রঙা। যদিও পেছনটা তার গোড়ালি থেকে দু'ইঞ্চি বেরিয়ে আছে, পা ফেললেই ফট-ফট্ শব্দ হচ্ছে। তবু, আহুক প্রথমে যেরকম ঘাবড়ে দিয়েছিলেন "কিছুই না পরে" থাকতে হবে বলে, সেই আতঙ্ক যে কাটিয়ে উঠেছে এই ঢের।

সত্যি! ভারি চমৎকার, অসাধারণ একজন মানুষ এই আহুক বোস। বয়সটা যদি

একটু কম হতো তবে ... কী ভালই না হতো। তবে আহুক বোস খেলুড়ে পুরুষ। আজ রাতে সমুদ্রস্নানে যেতে রাজি হয়েছে রংকিনী। সেখানে বেলাভূমি, এই গা-ছম-ছম আদিগন্ত নির্জনতা, মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা ভূতড়ে চাঁদ আর চারধারের পাহাড় থেকে ঝুঁকে পড়া জঙ্গল এবং বড় বাঘের মতো অপ্রতিরোধ্য, ভাললাগার মতো পুরুষ আহুক বোস।

এইসব উপাদান মিলে যে রংকিনীর শরীর-মনে কী রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটাবে সে সম্বন্ধে সে নিজে আদৌ নিশ্চিত নয়। একটা অননুভূত প্রচ্ছন্ন আনন্দ ভারতীয় মূল-ভূখণ্ডর রোমশ উষ্ণ গরম কাঠবিড়ালির মতো এবং এই দ্বীপের অদেখা ইগুয়ানোরই মতো এক অননুভূত ঠাণ্ডায় ঘিনঘিনে ভয়ও মাঝে মাঝেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। টেনশন হচ্ছে, টেনশন। মনে মনে প্রার্থনা করছে, আজ যেন দিনটি না ফুরোয়। আর প্রার্থনা করছে, সেই ঝাঁকড়া-চুলের শুঁটকি-মাছ খেকো নারী-বিদ্বেষী ভীরাপ্পান নামক অদেখা মানুষটি যেন সন্ধে নামার আগেই ফিরে আসে "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এ, দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে।

কী হল গান-এর?

আহুক আবার বললেন, কিচেন থেকে।

তারপরেই বললেন তুমি ঝাল খাও তো?

খাই। আমরা তো বাঙাল। বদ্যি। দেখছেন না, সেনগুপ্ত?

বদ্যি তো কি হল?

আরে পূর্ববঙ্গ ছাড়া বদ্যি আর কোথাওই তো ছিল না। এখন না হয় উদ্বাস্তু হয়ে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে গেছি আমরা।

তাই? জানতাম না তো। তবে জানতাম যে, বদ্যিরা খুব মেধাবী হন পড়াশুনোয় এবং অধিকাংশই দেখতে ভাল হন না। বিশেষ করে, মেয়েরা। তবে সুন্দর হলে তারা হয় সুচিত্রা সেন, নয় অপর্ণা সেন, নয় রংকিনী সেনগুপ্ত।

কেন লেগপুল করছেন মিছিমিছি। এখানে আয়না নেই বলে কি আমি জানি না আমি কেমন দেখতে?

তোমার বাবা কি করেন? তাঁর নাম কি?

আমার বাবা নেই।

সে কি! তুমি কি কনিষ্ঠ সন্তান।

না। আমি বড়।

কম বয়সেই গেছেন?

হ্যাঁ। তবে খুব অল্প বয়সে নয়।

কী করতেন তোমার বাবা?

বলবার মতো তেমন কিছু নয়। হি ওজ নট ওয়েল—অফফ ইদার। বোহেমিয়ান ছিলেন। লেগে থেকে কিছু করা তাঁর চরিত্রে ছিল না। তবে, করতেন অনেক কিছুই।

লিখতেন, গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন। এসব করে সামান্যই টাকা পেতেন। আমাদের সংসার চালাতেন মা-ই। বলতে পারেন উই আর আ সর্ট অফ আ ম্যাট্রিয়ার্কল ফ্যামিলি। বাংলাতে যেন কি বলে?

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কী করতেন? মা?

অধ্যাপনা করতেন তিনি। এখনও করেন।

তোমার বাবাব নাম বললে না?

অসমঞ্জ রায়।

কী বললে? উত্তেজিত হয়ে বললেন আহুক।

তারপরই স্বগতোক্তি করলেন, ও, না না। তিনি তো সেনগুপ্ত ছিলেন না।

আমরা সেনগুপ্তই কিন্তু বাবা আমাদের জমিদারীর খেতাব "রায়ই" লিখতেন। ঠাকুর্দারই মতো।

কোথাকার জমিদার ছিলে তোমরা?

ছাড়ুন তো! জমিদার না জমাদাব তা কে জানে! থাকলে না প্রমাণ দিতে পারতাম।

তার মানে, তার মানে ... বলতে বলতে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, আরে আমি তো তোমার বাবার একজন আর্ডেন্ট অ্যাডমায়রার। হি ওজ আ গ্রেট ম্যান। আ ভারসেটাইল জিনিয়াস।

তাই?

অবিশ্বাসের গলাতে বলল, রংকিনী।

তারপরই বলল, কাঁকড়াটা খারাপ হয়ে যাবে, সম্ভবত প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যেই।

একটুক্ষণ অবাক চোখে রংকিনীর চোখে চেয়ে থেকে আহুক আবার কিচেনে চলে গেলেন।

গিয়েই, কিচেন থেকেই আহুক আবৃত্তি করলেন :

"সামান্য যে ছোট্ট সাদা পাখি
তারও আছে মনের মানুষ কোনো,
তারও আছে ফাগুন দিনের ঘর,
আর তোমার?
তোমার শুধুই অনন্ত যৌবন,
তোমার শুধুই অনন্ত যন্ত্রণা
লক্ষ হাতে বৃথাই খুঁজে মরা।
আপন হবে, এমন নেই কো কেউ
ফোঁসফোসানি সাঙ্গ করে তটে
নেতিয়ে পড়ে সাপের মতো ঢেউ।
শোনো শোনো, নীল বারিধি শোনো

দিকদিগন্তে মেলে সুনীল কান,
সুখী যারা, তারা সবাই ছোট,
আমার মতো মানুষ,
কিংবা পাখি।"

কবিতার নাম "সমুদ্রকে"।

বাঃ বাঃ। আপনি দেখছি ভারসেটাইল জিনিয়াস। কবিতাও লিখতে পারেন, কাঁকড়াও রান্না করতে পারেন, ডায়াস্কোরিয়ার চাষ করেন এবং পাখির নীড়ও রপ্তানি করেন. সত্যি!

কবিতাটা তোমার বাবার লেখা।

তাই? মুখস্ত করে রেখেছেন আপনি?

কী করব। যাদের মুখস্ত করার কথা ছিল তারা যখন করল না তখন ...

বলেই, আবার আবৃত্তি করলেন আহুক তাঁর প্রিয় কবিতাটি। তার আগে বললেন, কবিতার নাম "আছে"।

"আছে। আছে। আছে।
সবই আছে।
ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন,
জীবনের প্রথম সঙ্গমের সুখস্মৃতির মতন,
আমার নবতম প্রেমিকার ফুটি-না-ফুটি
ফুলগন্ধী প্রেমেরই মতন,
স্বপ্নে দেখা তার ফলসাবরণ শাড়ির মতন,
অদেখা তার আগুন-পারা নগ্নতার মতন
সবই আছে।
বনে, বালুতটে, স্থলে,
আছে মৎসগন্ধী জলে,
মাছে,
আছে, আছে, আছে।
সবই আছে।"

বাঃ। এটি যে আপনি একেবারে "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ বসেই লিখেছেন তা বোঝা যায়। চমৎকার।

রংকিনী বলল।

এটাও তো তোমার বাবারই কবিতা। তিনি তো এই দ্বীপে কখনও আসেননি। অসমঞ্জ রায়ের মূল্যায়ন এই টাকা-সর্বস্ব কম্প্যুটার-সর্বস্ব, স্বার্থ-সর্বস্ব পৃথিবী করবে কী করে! এই পৃথিবী কি মীর্জা ঘালিবেরই যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিল? তাঁর জীবদ্দশাতে? কাব্য-সাহিত্য শিল্পের বিচার কোনওদিনই তাৎক্ষণিক নয়। এসবের বিচারক মহাকাল। সময়কে সময় দিতে হবে বইকি।

রংকিনী কোনও মন্তব্য করল না।

বাবাঃ। কী মেঘ করেছে। এযে একেবারে অন্ধকার করে এল। দিন না রাত বোঝারই উপায় নেই।

রংকিনী জানালা দিয়ে সমুদ্রের আর আকাশের দিকে চেয়ে বলল।

কোথায়?

বলে, আস্ত্ক কিচেন ছেড়ে পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে দেখে বললেন, তাতে কী? 'দ্যা হর্ণেটস্ নেস্ট' এর রাতকেও যে রাত বলে বোঝা যায় না এখন চাঁদের আলোতে। এখানের রাতে দিনে ভেদ নেই।

কী ভয়ানক-দর্শন মেঘ রে বাবা। টর্নাডো বা সাইক্লোন-টাইক্লোন হবে না তো?

না। এই মেঘপুঞ্জের নাম CUMULO-NIMBUS

মানে? মেঘের আবার নাম হয় না কি?

হয় না? কালিদাস-এর "মেঘদূত"-এ বিরহী যখন তার প্রিয়ার খোঁজ করতে মেঘপুঞ্জকে পাঠাতেন তখন কি মেঘের নাম জানতেন না? ক্যুরিয়ার-এর নাম না জেনে কেউ কি চিঠি পাঠায়?

অনেক রকমের মেঘ হয় বুঝি?

নিশ্চয়ই হয়। তবে আমি তো আবহাওয়াবিদ নই, প্লেনের পাইলটও নই, তাই আমি আর কতটুকু জানি? তবে কিছু কিছু নাম অবশ্যই জানি। যেমন NIMBUS এক ধরনের মেঘের নাম। সেই মেঘই যখন পুঞ্জিভূত হয় তখন তাদের বলে CUMULO-NIMBUS নিচে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ থাকে। উপরে সাদা। আবার পাতলা পাতলা পেঁজা-তুলোর মতো ঊর্ধ্বমুখী সাদা মেঘকে বলে CIRRUS। তাদেরই যখন আবার ছানার ডালনার কাটা-ছানার মতো ছাড়া ছাড়া দেখায় তখন তাদের বলে CIRRO CUMULOS। CIRRO যখন সমান্তরাল গড়নে দেখা যায় তখন তাদের নাম হয়ে যায় CIRRO-STRATUS। বুঝলে তো? STRATA থেকে STRATUS। STRATUS এরও নিচের দিকে জলবাহী কালো মেঘ থাকে আর উপরে সাদা। STRATO যখন পুঞ্জীভূত হয় তখন তা হয়ে যায় CUMULUS STRATO CUMULUS। খুব কালো যখন দেখায় STRATUS-কে তখন তাদের বলে ALTO-STRATUS। STRATUS থাকে সবচেয়ে নিচে, ধরো, পনেরোশো যোলোশো ফিট। তার উপরে ছ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় অন্যদের। হাজার থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ফিট অবধি দেখা যায় ALTO CUMULOS, CUMULO-NIMBUS, ALTO-STRATUS এবং CIRRO-STRATUS-দের। তারও উপরে উঠলে চল্লিশ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় CIRRUS আর CIRRO-CUMULUS দের। চল্লিশ হাজার ফিটের উপরে, দিনের বেলা হয়ত দেখে থাকবে অনেক সময়ে জেট প্লেনের জানালা দিয়ে, বহুরঙা, রামধনুর মতো স্বপ্নময় কিন্তু সমান্তরাল মেঘপুঞ্জ —তাদের নাম IRIDISCENT CLOUDS।

বাবাঃ। আপনি কি পাইলট ছিলেন নাকি?

ছিলাম কী? এখনও আছি। তবে প্লেন কখনও চালাইনি। আমি মেঘের উড়োজাহাজ চালাই। কল্পনাতে।

বাঃ। রংকিনী বলল। অ্যাডমায়ারিং চোখে।

আফ্রিকাতে যখন পেশাদার শিকারীর কাজ করতাম, সুয়েড, অস্ট্রেলিয়ান, অ্যামেরিকান, কানাডিয়ান, সুইস সব শিকারীদের নিয়ে সাফারিতে যেতাম, তখন রাতের বেলা তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে মেঘনবিশ হয়ে উঠেছিলাম নানা বই নেড়েচেড়ে।

বৃষ্টি হতো না?

নাঃ। অধিকাংশ সাফারিই তো হতো জুলাই-এ।

সে কি! জুলাইয়ে বৃষ্টি হবে না তো কোন সময়ে হবে?

আহুক হেসে ফেললেন। বললেন, বিদূষী, সুন্দরী নারী, এই পৃথিবীটা মস্ত বড়। জুলাইতে ভারতে বর্ষার ঘনঘটা থাকে অবশ্যই কিন্তু আফ্রিকার, বিশেষ করে পুব আফ্রিকার কেনিয়া ও তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি, গোরোউগোরো, ঐসব অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসই শীতকাল। আকাশ নির্মেঘ থাকে তখন। সুনীলও। রাতে কনকনে ঠাণ্ডা। দিনে প্লেজেন্ট।

সত্যি! আপনার সঙ্গে দিনকয়েক থাকতে পারলে কত বিষয়ে যে বিশারদ হয়ে যাব। ভাবা যায় না।

কে বলতে পারে! গুল-বাঘও হতে পারো।

বলেই বললেন, যাই। কাঁকড়ার ঠ্যাংগুলো কাঁদছে, তাদের সুশ্রূষা করি গিয়ে। খারাপ হলে, তো তুমি আবার আমার মালকিন-এর কাছে বদনাম করবে আমার।

হেসে উঠল রংকিনী।

তারপর বলল, মেগাপড পাখিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও তো পুরো বললেন না। ওদের সম্বন্ধে আর কী জানেন বলুন না। কলকাতাতে গিয়ে ভাইকে জ্ঞান দেব।

ও তাহলে তুমিও জ্ঞান দাও।

তারপর বললেন, মেগাপডদের কি বিশেষত্ব জানো? তারা ডিমে তা দিতে বসে না। এমন সব পাতা-পুতা, উদ্ভিদ, বালির উপরে ডিম পাড়ে যে এইসব জিনিসের উষ্ণতাতেই ইনকিউবেশন হয়ে যায়। ডিম ফোটে। আর অকালপক্ক বাচ্চারা ডিম ফুটেই স্বাবলম্বী হয়ে "হিজ-হিজ হুজ-হুজ" জিম্মাদারী নিয়ে পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে পড়ে।

তারপর বললেন, তুমি রয়্যাল আলবাট্রস পাখির নাম শুনেছ তো? রয়্যাল আলবাট্রসের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পরে সেইসব রাজকীয় বাচ্চারা সব ন্যাকা-খোকা ন্যাকা-খুকু হয়ে থাকে আট মাসেরও উপরে। তারপরে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মায়ের আঁচল ছাড়ে। এই পৃথিবী যে শুধুই বিরাট তাই নয় রংকিনী, তুমি কি জানো এই পৃথিবী কী বিচিত্র, ঈশ্বরের কী আশ্চর্য সৃষ্টি। অগণ্য এই গাছ-গাছালি, পাখ-

পাখালি, পোকা মাকড়, জীবজন্তু, জলচর, স্থলচর, আবার ইগুয়ানোর মতো উভচর? এই পৃথিবী, এই ব্রহ্মাণ্ড?

এ বাবা! আপনি আবার ঈশ্বর-কিশ্বরে বিশ্বাস করেন না কি? এ কী প্রি-হিস্টরিক মানুষ আপনি!

করি। গভীরভাবে করি। ঈশ্বরবোধ ব্যাপারটা একজন মানুষের ভিতরে আসতে অনেক গভীরতা, অনেক জন্মের পুণ্য লাগে রংকিনী। তুমি হয়ত গত জন্মে তেলাপোকা বা কাঁকড়া ছিলে। বা, ইগুয়ানো। তারপরের জন্মেই কোনও দৈব-দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে জন্মালে তো তোমার মধ্যে ঈশ্বরবোধ জন্মাতে পারে না। ঈশ্বর-বোধ এই কারণেই সকলের মধ্যে থাকে না। ধৈর্য ধরতে হবে। যখন আসার, যদি আসে, তখন ঠিকই আসবে। তবে কত জন্ম পরে, তা কে জানে!

কী জানি বাবা। এই বিজ্ঞানের যুগে কি করে একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ এমন ঈশ্বর-ঈশ্বর করেন ভাবা যায় না।

অন্য কথা ভাব। তাছাড়া, আমি বুদ্ধিজীবী নই, দুর্বুদ্ধিজীবী। তোমাকে একটা কথা বলি। নিরীশ্বরবাদী হওয়ার মধ্যে সপ্রতিভতা আছে, তা অবশ্যই ফ্যাশানেবলও বটে, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী হতেও অসুবিধে দেখি না। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও বিরোধ নেই। আমি মূর্তিপুজোর কথা বলছি না। যদিও তার মধ্যে দোষেরও কিছু দেখি না। তুমি বিবেকানন্দ পড়েছ কি? পড়ে দেখো। আমি কী বলছি, তা তখন বুঝতে পারবে। আইনস্টাইন, পাকিস্তানের নোবেল প্রাইজ পাওয়া পদার্থবিদ কালাম সাহেব, ওয়াল্ট হুইটম্যান, লিও টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। আমি তো তাঁদের চেয়ে অনেকই নিকৃষ্ট। ঈশ্বরকে মানার মধ্যে, স্বীকার করার মধ্যে কোনও লজ্জা বা অগৌরব নেই। বরং অস্বীকার করার মধ্যেই আছে। বিজ্ঞান আজ অবধি কিছুমাত্র উদ্ভাবন করেনি, শুধু আবিষ্কারই করেছে মাত্র। অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে। এই অতি-মাত্রায় বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মানুষেরাই একদিন পৃথিবীর সর্বনাশ ডেকে আনবে। ফ্যাশানেবল, এবং আপাত সপ্রতিভ হওয়ার চেয়েও সত্য এবং শাশ্বতকে স্বীকার করতে অনেকই বেশি সাহসী হতে হয়। ব্যতিক্রম হওয়ার চেষ্টা করাটাই কি ভাল নয় জীবনে? সহজে সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠার চেয়ে?

রংকিনী চুপ করেই রইল। বাইরে চেয়ে রইল। আকাশের ঘনঘটা পরিপূর্ণ হল। ঘন কালো বেনারসী পরেছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ তাতে চকিতে রুপোলি জরির পাড় বসিয়ে দিচ্ছে, আর গলাতে ওড়িশী ফিলিগ্রি কাজের রুপোর গয়না পরিয়ে দিয়েই খুলে নিচ্ছে পরমুহূর্তে। এমন সময়ে হঠাৎই পুব দিক থেকে একটা জোর হাওয়া উঠল।

আহুক বললেন, "পুব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরিমরি।"

বলেই বললেন, জানো গানটা? জানলে গাও না রংকিনী। তোমার একজন এমন অনুরাগীকে এমন পরিবেশে এই "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ বসে গান শোনাবার সুযোগ

হয়ত আর আসবে না। জীবনে কোন সুযোগটি, কোন মানুষটি, কখন যে কোন মানুষের দুয়ারে এসে করাঘাত করে তা আমরা বুঝতে পারি না বলেই সারা জীবন হাহাকার করে মরি। যা পড়ে-পাওয়া, তা পড়ে-পাওয়া বলেই তাকে হেলা করতে নেই। "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন" পড়নি কি? গাও গাও, যদি গানটি জানো, তবে গাও। এই পূবালি হাওয়াতে এই কিউমুলাস নিম্বাস মেঘের স্তূপ এখুনি উড়ে যাবে, আজ জ্যোৎস্না রাতেই আমরা সমুদ্রে নাইব মনে হচ্ছে। এইরকমই ইচ্ছা ঈশ্বরের। গাও, প্লিজ।

রংকিনীর মধ্যে থেকে হঠাৎই কে যেন নিরুচ্চারে বলে উঠল, গাও, গাও, কিন্তু গাইবার সময়ে ও অন্য গান ধরল :

"আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে।।
সেদিন রাগিনী গেছে থেমে, অতল বিরহে থেমে গেছে থেমে,
আজি পূবের হাওয়ায় হাওয়ায়, হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে।।"

আহুক কিচেন থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গায়ের গাঢ় হলুদ-রঙা রান্না করার অ্যাপ্রনের কোনাগুলি হাওয়াতে উড়ছিল। কাঁচা-পাকা দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা পেছনের চুল এলোমেলো হচ্ছিল। এই গান, এই সমুদ্র, এই আকাশ, এই মেঘ, এই পাখি-দ্বীপ সবকিছুকেই যেন আহুক একই সঙ্গে এক নীরব অদৃশ্য মন্থনে তার হৃদয়ে টেনে নিতে চাইছিলেন — হাওয়ায়-খসা ফুল-পাতা, হরজাই-গাছ থেকে আচমকা খসে-যাওয়া মিশ্র গন্ধ, নানা পাখির কিচির-মিচির, স্ফুট-অস্ফুট আওয়াজ, এসবে তিনি যেন পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে গেছেন।

রংকিনী ভাবছিল, পেছন-ফেরা মানুষটার দিকে চেয়ে, এখানে বছরের পর বছর একা থেকেও এত ভাললাগা-ভালবাসা বেঁচে আছে প্রকৃতির প্রতি, পরিবেশের প্রতি মানুষটার। আশ্চর্য! পর মুহূর্তেই ভাবল, এই গভীর ভালবাসা তাঁর বুকে না থাকলে কি এমন আনন্দে এই নিভৃত ভয়াবহ নির্জনতাতে তিনি এতো দীর্ঘদিন আদৌ থাকতে পারতেন? তারপর ভাবল, কে জানে! মানুষটা হয়তো কোনও খুন-টুন করেছেন। স্মাগলার-টাগলার, নয় ফেরারী আসামী। সেলুলার জেল থেকেই পালানো নয়ত? জেলখানা থেকে না হলেও হয়ত পালাতে চাইছেন কোনও মানুষের কাছ থেকে, কোনও বিশেষ কোলাহলের জীবন থেকে। অথবা কে জানে! হয়ত নিজেরই কাছ থেকে। নইলে কী করে সম্ভব হয় এমন করে থাকা? না, খবরের কাগজ, না রেডিও, না টিভি, না বিজলি আলো এমন কি না সৌরশক্তি। মানুষটা হয় কোনও মেন্টাল-কেস, নয় দেবতা। ভূতও হতে পারেন। তা হওয়ার সম্ভাবনাই হয়ত বেশি। সে কথা মনে হতেই ঐ কালো-করা আকাশ আর ঢেউ-লাগা সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভীষণই ভয় করতে লাগল রংকিনীর।

আহুক বললেন, আমার ফরমায়েসি গানটা শোনালে না আমাকে?

শোনাচ্ছি, শোনাচ্ছি, বলল, রংকিনী। যেন ভূতের হাতের থাপ্পড় খাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবারই জন্যে।

বলেই, ধরে দিল গানটি। কিন্তু ধরল সঞ্চারী থেকে। কেন জানে না।

"ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।।

মিলবে যে আজ অকূল পানে, তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।
পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি ..."

আহুক একবার রংকিনীর দিকে একটা রহস্যময়, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার কিচেনে ঢুকে গেলেন।

রংকিনীর ভীষণই ভয় করতে লাগল। কে জানে, কী হবে আজ রাতে! মিথ্যে বলবে না, কিছু যে হবে, হতে পারে, একথা ভেবে ভয় যেমন হচ্ছিল, একটা আনন্দময় চাপা উত্তেজনাও বোধ করছিল ও ভিতরে ভিতরে।

১১

ওরা পাকদণ্ডী পথে বাংলো থেকে নামছিল সমুদ্রতটের দিকে। এই পথ দিয়ে গতকাল ও জেটি থেকে উঠে আসেনি বা দ্বীপটি ঘুরে দেখার সময়ও এপথে যায়নি। এটি একেবারে অন্য পথ। শুধুই তটে যাবার। তটে চান করার জন্যে আর সান এবং মুন বেদিং করার জন্যে।

আহুক বলছিলেন।

ঘুরে ঘুরে নেমেছে পথটা গুর্জন গাছের ছায়ায় ছায়ায়। একটা গাছ দেখিয়ে আহুক বললেন, দেখো, এটা বাকোটা গাছ। আর এটা বাদাম। আর ওটা কোকো। এসবই হার্ডউড। আর একটু নামলেই, সমুদ্রতটের থেকে বেশ কিছুটা উপরে দেখবে শুধুই সিলভার-গ্রে গাছ। কাণ্ডর অনেকখানি সিলভার গ্রে। চাঁদ উঠলে দেখবে, এই বনের শোভা। বিশেষ করে পূর্ণিমার দিনে।

পূর্ণিমা কবে?

আর ঠিক সাতদিন পরে।

তারপর দিনই সকালে আমি চলে যাব এখান থেকে।

হ্যাঁ তারপর থেকে আর চাঁদ উঠবে না "দ্যা হর্ণেটস্ নেস্ট"-এ।

তারপর স্বগতোক্তির মতোই আহুক বললেন, এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কি একবারে এসে ভাল করে দেখা যায়? আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটিকেই এতো বছরে রাত-দিন থেকে তবুও পুরো জানলাম না। প্রকৃতির রহস্য বড় গভীর রহস্য। এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের জীবনের এবং হয়তো মৃত্যুরও সব রহস্য। সবকিছুর রহস্য। প্রকৃতিই যে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ। এর মধ্যে থেকেই আমাদের গান, আমাদের দর্শন, আমাদের অধ্যাত্মবাদ সবকিছুই উদ্ভূত। জানো তো রংকিনী, এই দ্বীপপুঞ্জে পাঁচশোর বেশি দ্বীপ এবং দ্বীপানু আছে তার মধ্যে মাত্র উনচল্লিশটি দ্বীপেই শুধু মানুষের বসবাস। "দ্যা হর্ণেটস্ নেস্ট" কিন্তু উনচল্লিশটির মধ্যে পড়ে না। কোনও ম্যাপেও পাবে না একে। মাত্র দুজন বনমানুষ যদি কেনও দ্বীপে বাস করে তবে তাকে "Inhabitated" বলবে না ত কেউই। একবার চলে এসো বছরখানেকের জন্যে। তখন আতি-পাতি করে খুঁজতে পারবে এই দ্বীপকে, খুঁজতে পারবে নিজেকে।

বছরখানেকের জন্যে? আপনি কি পাগল?

কেন? ছুটি জমিয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়েও চলে আসতে পারো। তুমি যদি আসবে বলে কথা দাও, তবে আমিও চুমকির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি আনচার্টেড দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়ব। সেখানে ভীরাপ্পানও থাকবে না। থাকব শুধু আমি আর তুমি।

তাই? ইস। ভাবতেই কী ভাল লাগছে।

গলায় শিহর তুলে বলল রংকিনী।

তারপর বলল, আজ দুপুরে যেমন কাঁকড়া রান্না করে খাওয়ালেন তেমন কাঁকড়া খাওয়াবেন তো?

নিশ্চয়ই। আর কি শুধুই কাঁকড়া? সুরমেই, ম্যাকারেল, টুনা মাছ। বাগদা আর গলদা চিংড়ি এবং অক্টোপাসও খাওয়াব। খাওযাব ইগুয়ানো, আর ফল-খাওয়া স্বাদু বাদুড়ের রোস্ট। সামুদ্রিক সি-কুকুম্বার, সি আর্চিনস। মুসেলস্ খেয়েছ কি কখনও? জার্মান আর স্প্যানিশরা খুব তরিবৎ করে খায়। মুসেলস্ এখানেও পাওয়া যায়। আমি এমন রান্না করব যে, তা ফেলে আর অন্য কিছুই খেতে ইচ্ছে করবে না।

তারপর বললেন, আরে। আমিই যদি সব কিছু করব, তুমি সেই দ্বীপে কি করবে?

আপনার দেখাশোনা করব। আপনাকে আদর করব, আপনার আদর খাব। আমাদের বেশ একটা গাঁট্টা-গোঁট্টা ছেলে হবে। আপনার মতো হবে সে।

না না। সন্তান যদি হতেই হয় তবে একটি মেয়ে। তোমার মতো সুইটি-পাই।

তাই?

বলেই। হো হো করে হেসে উঠল রংকিনী।

বলল, স্বপ্নেই যখন রাঁধছি পোলাউ, তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষীই বা করব কেন?

আহুকও খুব হাসছিলেন।

বললেন, বাবা। তুমি ড্রাঙ্ক না হয়েই মাতালের মতো কথা বলছ দেখি।

বলছি, কারণ, স্বপ্ন তো স্বপ্নই! রোজ রোজ কি স্বপ্ন দেখা যায়? না। স্বপ্ন দেখা দেয় কারোকে?

তোমার থলেটা বইতে কষ্ট হচ্ছে না তো? জিনিস তো কম নেই। তোয়ালে দুটোর ওজনই কি কম?

হাতের ব্যাগের ভারে ডানদিকে নুয়ে পড়া রংকিনীকে বললেন আহুক।

না, না।

আহুকের দুহাতেও দুটি ব্যাগ। কী করে এখানে এই হাওয়ার মধ্যে আগুন জ্বালাবেন আহুক, তা আহুকই জানেন। ভাবছিল রংকিনী। আজ রাতের মেনু নাকি প্রন ককটেইল, আনারস আর ম্যাকারেল ভাজা। আহুক বলেছেন বোনলেসই করবেন। কাঁটা থাকলে একেবারেই খেতে পারে না রংকিনী, তাই। তারপর ব্যানানা ফ্রিটারস। এবং তারও পরে রেড ওয়াইন, অনেক গল্প করতে করতে চাঁদের আলো আর ফেনায় ভেজা তটভূমিতে শুয়ে শুয়ে।

আহুক বলেছিলেন, মুনলাইট পিকনিক তো দেশে-বিদেশে অনেকই করেছ "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এর এই মুনলাইট পিকনিক-এর কথা তুমি সারাজীবন মনে রাখবে।

তাই? দেখাই যাক।

তারপরেই রংকিনী বলল, আন্দামানে ওয়াইন কোথায় পেলেন? এখানে কি স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ বা অন্য কোনও ভাল ওয়াইন পাওয়া যায়?

না। বিদেশী ওয়াইন নয়। আমাদের দেশে যেসব ওয়াইন তৈরি হয়, তাই। মন্দ কি? দেশির মতো ভাল কি অন্য কোনও কিছুই? রুবী, গোলকোণ্ডা রিভিয়েরা, বসক। রেড ওয়াইন রাখি এখানে। কারণ, এখানে তো ফ্রিজ নেই। হোয়াইট ওয়াইন তো ঠাণ্ডা না করে খাওয়া যায় না। তাছাড়া মাছ মাংসই তো খাই বেশি তাই রেড ওয়াইনই রাখি।

রোজ খান?

পাগল! বছরে হয়তো চার-পাঁচ দিন। কচিৎ কেউ এখানে এলে যদি কারো জন্মদিন এখানে পড়ে যায় সেই জন্মদিনে। দোল পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিমা আর বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে। রিলিজিয়াসলি!

কেন?

চাঁদের সঙ্গে আমার নাড়ি বাঁধা। বলতে পারো, দাড়িও বাঁধা। চাঁদের আলো যেমন এই সমুদ্রমেখলার জোয়ার-ভাঁটা, ভরা-কোটাল মরা-কোটালকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমন তা করে আমাকেও। পূর্ণিমাতে আমার শিরা-উপশিরাতে রক্ত অনেকই বেশি দ্রুত চলাচল করে। পাগল-পাগল লাগে আমার।

আপনার জন্মদিন কবে?

জেনে কি হবে? কার্ড আসবে না এখানে। এখানে ওয়েব-সাইট, ই-মেইল, টেলিফোন কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু টেলিপ্যাথি। সেদিন তুমি আমাকে, তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'উইশ' করবে, সেদিন আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পাব।

বলবেন তো জন্মদিনটা কবে? না, বলবেন না?

আমি জন্মাইনি। মানে, কী বলি! আমার মা ইছামতি নদীতে জ্যৈষ্ঠর এক পূর্ণিমার রাতে নাইতে নেমেছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন একটা হাঁড়ি ভেসে আসছে আর তার ভেতর থেকে শিশুর কান্না। মা আমাকে পেলেন। আমি মাকে। আমার মায়ের কোনও সন্তান ছিল না, জানো। তবে আমি তো কানীনই।

কানীন কাকে বলে জানি না তবে আপনার গল্প যদি সত্যিও হয় তবে বলব যে আপনার আসল মা ও বাবা অনেক পুণ্যবান পুণ্যবতী। তবে, আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না।

কেন? এ কী অন্যায় কথা।

কেন আবার কি? আপনি গুলবাঘ তাই।

তারপর রংকিনী বলল, এমন অদ্ভুত নাম কেন হল আপনার বলুন তো? আহুক। আপনার যদি ছেলে হয় তবে তার নাম রাখবেন ডাহুক। বেশ মিল হবে।

আর মেয়ে হলে, যদি কখনও হয়?

তার নাম রাখবেন জলপিপি।

বাঃ। দারুণ নাম।

এই নামের জন্যই আপনার একটি মেয়ে হতেই হবে। যাক এবারে আপনার নামের মানেটা বলুন।

মানে নেই। প্রপার নাউন। তুমি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অবশ্যই পড়োনি। তোমাদের এসব বলেই বা কি লাভ? ভোজ-রাজএর বংশে একজন পরাক্রমশালী স্বচ্চরিত্র রাজা ছিলেন। তাঁরই নাম ছিল আহুক। আহুকের স্ত্রীর নাম ছিল কাশ্যা।

কী?

কাশ্যা।

ও!

এবারে তোমার অদ্ভুত নামের মানেটা বল। রংকিনী নামে কোনও শব্দ তো বাংলা ভাষায় নেই বলেই জানি। তবে সম্ভবত রংকিনী, রঙ্গিনীরই সমার্থক। তবে রঙ্গিনীর যা মানে তার সঙ্গে তোমার চরিত্রের তো কোনও মিল নেই।

কী স্ত্রী আর কী পুরুষ তাদের যখন নামকরণ করা হয় শৈশবাবস্থাতে, তখন তো তাদের স্বভাব-চরিত্র পরে কেমন হবে না হবে তা জানা যায় না। তাই নামের সঙ্গে মানুষ অনেক সময়েই মেলে না। যার নাম সুধীর সে অত্যন্ত চঞ্চল, যার নাম ক্যাবলা সে অত্যন্ত স্মার্ট।

তোমার নাম নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন তোমার বাবাই।

না। আমার এবং আমার ভাইয়ের নাম দিয়েছিলেন আমার মা-ই। বলেছিলাম না যে, আমাদের পরিবারে আমার বাবার প্রায় কোনওরকম ভূমিকাই ছিল না।

তাই? বোধহয়, ভালই হয়েছিল। তাই তিনি মুক্ত হয়ে নিজের কাজ করতে পেরেছিলেন সারা জীবন। যদিও তাঁর আয়ু ছিল না খুব বেশিদিন।

মুক্ত হবার প্রশ্ন আসে বন্ধন থাকলেই। বাবা তো কোনওদিনও কোনও বন্ধন স্বীকার করেননি। দায়িত্বও নয়। কবি বা লেখক হয়তো উনি বড় ছিলেন, আপনারাই জানবেন, যাঁরা ওঁর লেখা পড়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন বাবা।

তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য আসলে আমার মতো লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের প্রতি ছিল। তাই নিজের পরিবারের কথা ভাবেনইনি হয়ত। আসলে ব্যাপারটা কি জানো? সূর্যর কাছে গেলে, বা থাকলে তো সূর্যকে সূর্য বলে চেনা যায় না। তাই তোমরাও ...

আহুক বললেন।

তা হবে হয়ত। রংকিনী বলল।

নামের কথাতে ফিরি। আমার নামের কোনও মানে আছে কি না তা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি আমারই মতো হতে চেয়েছিলাম, নামের মতো নয়। মাও কোনওদিন নামের মানে ব্যাখ্যা করে বলেননি আমাকে। হয়ত রঙ্গিনী করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তা যে হয়নি, তাতে মা দুঃখিতই হয়েছেন হয়তো। জানি না। আমার মায়ের মধ্যে একজন সুপ্ত রঙ্গিনী ছিলেন যিনি মাঝে মাঝেই আছেন বলে জানান দিতেন।

বলেই, বাঃ। বলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রংকিনী।

এমন শেষ বিকেল এখানে রোজই আসে। আহুক বললেন। আমি রোজই সকাল হওয়া দেখি পাহাড়ে বসে আর সন্ধে হওয়া দেখি এখানে। আশ্চর্য! কোনও সকালের সঙ্গে কোনও সকালের এবং কোনও সন্ধের সঙ্গে কোনও সন্ধের একটুও মিল নেই। ভাবা যায়?

এটা কি গাছ? দু'রকম গাছ একই সঙ্গে? বাঃ।

হ্যাঁ। প্লান্ট-লাইফএ একেই বলে সিমবায়োসিস। গুর্জন গাছটার দু'ডালের সঙ্গমে ফোকর হয়েছিল কখনও একটা। তাতে বছরের পর বছর গ্রীষ্ম-বর্ষাতে বাকল, ঝড়ে-ওড়া ফুল-পাতা, ধুলোবালি-খড়কুটো উড়ে এসে পড়ে পড়ে জমির সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছের ফুলের পরাগ বা বীজ কোনও পাখি এনে ফেলেছিল গত বর্ষার আগে। আর দেখো, ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছ গজিয়ে গেছে ফোকরে। যখন ফুল ফুটবে কী দারুণ যে দেখাবে।

কি গাছ বললেন?

ফ্ল্যামবয়ান্ট। এই গাছের বীজ আমি এখানে আসার পরই আনিয়েছিলাম সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জের ভিক্টোরিয়া থেকে। কৃষ্ণচূড়াব চেয়েও অনেক বেশি ঝলমলে এরা। সেশ্যেলস এর Endemic গাছ। কিন্তু এখানে কী চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে দেখো। যদি আর পাঁচটা বছর থাকি এখানে, তবে পুরো হর্ণেট্স নেস্টকে ফ্ল্যামবয়ান্টে ভরে দেব। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষে এডিবল হোয়াইট নেস্ট স্যুইটলেট পাখির, তাদের বাসা আর ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছ দেখতে আসবে। তারপর বললেন, এই গাছকে কিন্তু ফ্ল্যামবয়ান্ট ছাড়া অন্য কোনও নামেই মানাত না। তাই না?

ঠিক তাই।

ওরা এবারে ফিকে-গেরুয়া তটে নেমে এসেছে। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই তটভূমি প্রায় একটি সমকৌণিক বাঁক নিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে। আর সেই বাঁকের মুখে, পাহাড়ের গায়ে, স্যান্ডস্টোনের একটি চাঙড় তটমুখী একটি প্রস্তরাশ্রয়ের সৃষ্টি করেছে। সেইখানেই সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখতে বললেন আহুক রংকিনীকে। নিজেও নিজের দুহাতের বোঝা নামালেন।

সূর্যটা এবার পশ্চিমের দিগন্তরেখাতে নেমে জলের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। নীলচে কালো জলে নেমে পড়বে এবারে কমলা রঙা একটি অতিকায় নরম বল।

আহুক বললেন, এই সব পরে তো তুমি সাঁতার কাটতে পারবে না। সব খুলে ফেল। এইখান থেকে বাঁদিকের তটভূমি তোমার আর ডানদিকেরটা আমার। আমরা যে যার দিকে থাকলে কেউই কাউকে দেখতে পাব না। এবং দেখার চেষ্টাও করব না। প্রমিস। আকাশ তোমাকে দেখবে. বাতাস, নগ্নিকা তোমার সর্বাঙ্গে চুমু খাবে, সমুদ্রের ফেনা তোমার জঘনে ফেনার লেস বুনে তোমার লজ্জাহরণ করবে। সূর্য ডুবে যাবার আগে তোমার গ্রীবাতে চুমু খেয়ে বলবে. গুড নাইট ইয়াং লেডি। তারপর চাঁদ,

অরমিতা তোমাকে জলের মধ্যে রমণ করবে। ভাবো তো একবার! এমন অভিজ্ঞতা "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ না এলে কি হতো?

বলেই বলল, ঠিক আছে তাহলে। কিন্তু সাঁতার ভাল জানো তো? নাকি ডুবে টুবে গিয়ে আমার সর্বনাশ করবে!

জানি। জানি। কত সমুদ্রে সাঁতার কেটে এলাম।

দূর থেকে সব সমুদ্রকেই এক মনে হয়, আসলে তা নয়। প্রত্যেকেরই স্বভাব-চরিত্র আলাদা। সাঁতার কাটলে বেশি ভিতরে যেয়ো না সমুদ্রের। কখনও কখনও আন্ডারকারেন্ট থাকে। নইলে এদিকে ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। চান করার জন্যে আইডিয়াল। চান করে খুবই আরাম। কাল দিনের বেলা এলে দেখবে কী স্বচ্ছ জল। নিচে নানা-রঙা মাছ সাঁতরে যাচ্ছে, নানা-গড়নের নানা-রঙের প্রবালের মধ্যে মধ্যে। কোনওরকম প্রয়োজন হলেই আমাকে ডেকো। না ডাকলে আমি ওদিকে যাব না। এই নাও তোমার তোয়ালে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

এই লক্ষ্মণ-গণ্ডি দিয়ে দিলাম। দেখো। বলেই, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বালির উপরে একটি লম্বা দাগ কেটে দিলেন আহুক।

রংকিনী চলে গেলে, আহুক সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখলেন। ডিস, কাপ, কাঁটা, চামচ, জলের গ্লাস, জলের বোতল, ওয়াইন গ্লাস, রেড ওয়াইনের বোতল, কাগজের ন্যাপকিন, ভিনিগারে ডোবানো নুন-লংকা হলুদ-মাখা ম্যাকারেল, আনারস, ফালি-ফালি করে কাটা, একটা বড় টেবল-ক্লথ, যাতে করে খাওয়াদাওয়ার পরে সবকিছু উপরে নিয়ে যেতে হবে পরিষ্কার করে তটভূমি থেকে, যাতে তা এমন সুন্দরই থাকে। আগুন, এই প্রস্তরাশ্রয়ের মধ্যেই জ্বালাবে। কাঠ এখানে এনে রাখাই আছে। ফুরিয়ে গেলেই ভীরাপ্পান নিয়ে এসে রাখে। জ্বালানী কাঠ। কাঠ-পোড়া ছাই ভিতরেই পড়ে থাকে। যেদিন বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া থাকে, সেদিন ধুয়ে যায় রান্নার জায়গাটা। আগুন জ্বালবার বা ছাইয়ের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। "আর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস টু অ্যাশেস, ডাস্ট টু ডাস্ট" হয়ে যায়।

সব গোছগাছ করে নিয়ে আহুক শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে। এই আসন্ন সন্ধের সামুদ্রিক শান্তির সবটুকু নিঃশেষে নিংড়ে নিতে চাইলেন নিজের বুকে। এই শান্তি, ধরা থাকবে কাল ভোর অবধি। ভোরে উঠে আবার প্রাণায়াম করবেন।

একা যখন থাকেন তখন জামাকাপড় পরেনই না। বাংলো থেকেই নগ্ন হয়ে আসেন। তোয়ালে একটা আনেন, পেতে শোবার জন্যে, চানের পরে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রকৃতিকে গ্রহণ করলে প্রকৃতি নিঃশেষে কিছুমাত্র বাকি না রেখে নিজেকে ধরা দেন। তবে আজ রংকিনী আছে বলেই নগ্ন হবেন না। প্রাণীর মধ্যে মানুষের বেলাই বিধাতা উল্টোটা করলেন কেন কে জানে। নগ্ন হলে, নারীর সৌন্দর্য এক ভিন্ন মাত্রা পায়। আর পুরুষকে কুৎসিত দেখায়। অন্তত তাঁর চোখে। নারীরা কোন চোখে পুরুষের নগ্নতা দেখেন তা তাঁরাই বলতে পারবেন। সমস্ত প্রাণী, পাখি, পোকাদের, এমনকি

মাছেদের মধ্যেও পুরুষেরাই সুন্দর। শুধু মানুষের বেলাই উল্টো। ভারি খারাপ লাগে ভাবলে।

সূর্যটা ডুবে গেছে কিন্তু সমুদ্রপারে এইরকম কলুষহীন আবহাওয়াতে কম করে আরও পনেরো মিনিট আলো থাকবে। জলের উপরে এবং পাশে আলো অনেকক্ষণ বেশি বেঁচে থাকে।

সূর্যটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই পুবাকাশে চাঁদ উঠল। আর মিনিট দশেক পরে আশ্চর্য সুন্দর এক বিভাতে ভরে যাবে এই সমুদ্রমেখলা তটভূমি ও পাহাড়। তখনই তিনি জলে নামবেন। মিনিট পনেরো সাঁতার কেটে এসে রান্নার যোগাড়যন্ত্র করবেন।

ভাবছিলেন আহুক, কাল সকালেই তো এসেছে রংকিনী অথচ মনে হচ্ছে যেন কত বছর সে আছে "দ্যা হর্ণেট্স নেস্ট"-এ। এ কথা হয়ত রংকিনীরও মনে হচ্ছে। প্রকৃতির এই যাদু। শহরে যে সখ্য, যে নৈকট্য হতে দশ বছর সময় লাগে তাই এখানে দশ মিনিটে হয়। কেন যে হয়, তা জানেন না আহুক। কিন্তু হয় যে, তা জানেন।

তিনি চান করে যখন তীরের দিকে সাঁতরে আসছেন সেই সময় হঠাৎই যেন রংকিনী চিৎকার করে উঠল মনে হল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই তড়িৎ গতিতে নিজের দিক পরিবর্তন করে ফ্রি-স্টাইলে যত জোরে পারেন জলের উপর দিয়ে সেই লক্ষণ-সীমা পেরোলেন।

না, রংকিনী তো গভীর জলে নেই, সে যে আন্ডারকারেন্টে পড়েছে তাও মনে হল না চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে কিন্তু মনে হল, ভীষণই ভয় পেয়ে সে তীরের দিকে সাঁতরে আসছিল। পায়ের তলায় বালি পাওয়া মাত্র সে সাঁতার কাটা থামিয়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে দৌড়ে আসতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলল তীরের দিকে আসতে। আহুক সাঁতরে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং পৌঁছতেই রংকিনী জ্ঞান হারিয়ে তাঁর প্রসারিত হাতের উপরে মূর্ছা গেল। আহুক তাঁকে দু-হাতে বেষ্টন করে তুলে ধরে হেঁটে তীরের দিকে আসতে লাগলেন। তিনি রংকিনীর চেয়ে অনেকই লম্বা। যেখানে সে মূর্ছা গেছিল সেখানে আহুকের কোমর জল। হঠাৎ কী একটা আওয়াজ হল যেন পেছনে। রংকিনীকে বুকে ধরে পেছন ফিরে চাইতেই জলের গভীরে একটি কালো ছায়া যেন নড়ে উঠেই সরে গেল গভীরতর জলে। মনে হলো। মনে হলো, কে যেন হাসল। হিঃ। হিঃ।। হিঃ।।।

ঠিক তিনবার।

কে?

টুনি কি?

রংকিনীকে পিঠের উপরে ফেলে বাঁ হাতে তার ছাড়া জামাকাপড় এবং তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সেই স্যান্ড-স্টোনের প্রস্তরাশ্রয়ের সামনে এসে তোয়ালে পেতে ওকে শুইয়ে দিলেন আহুক। চাঁদের আলোয় রংকিনীকে একটি মসৃণ, পেলব, সুন্দর সিলভার-গ্রে গাছের মতো, নাকি একটি টুনা মাছেরই মতো দেখাচ্ছিল।

রংকিনী ধবধবে ফর্সা নয়। তবে তার শরীরের যে যে অংশ আবৃত থাকে সেইসব

অংশ তার মুখ এবং হাত ও গলার চেয়ে অনেকই ফর্সা। এক উজ্জ্বল আভাতে মার্জিত তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অনেক অনেকই বছর পরে এই গা-ছমছমে নির্জন পাহাড়বেষ্টিত সমুদ্রের তটভূমিতে শুক্লা-অষ্টমীর জ্যোৎস্নাতে ফিকে-গেরুয়া বালিতে শায়ীন নগ্না রংকিনীকে দেখে তাঁর মধ্যে তীব্র কাম ভাবের উদ্রেক হল। তীব্রতর অস্বস্তির মধ্যে বুঝতে পেলেন যে, তিনি এখনও যুবকই আছেন। যে কোনও যুবতীকে শারীরিকভাবে সুখী করার ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই আছে। জেনে, পুলকিত হলেন।

শুধুমাত্র পুরুষেরাই জানেন, এমনটা না হলে কত বড় হীনম্মন্যতা জাগত তাঁর মনে নিজের সম্বন্ধে।

তার নিজের তোয়ালেটা এনে রংকিনীর গায়ের উপরে মেলে দিলেন, যাতে জ্ঞান ফিরলে সে লজ্জা না পায়। তারপর রংকিনীর পাশে বসে তার দু'হাতের এবং দু'পায়ের পাতা তাঁর নিজের দু'হাতের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে গরম করে দিতে লাগলেন। নাড়ি দেখলেন একবার। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু শ্লথ। এছাড়া উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

এদিকে তো বড় হাঙ্গর নেই। একটা এসেছিল বছর তিনেক আগে গভীর সমুদ্র থেকে। টাইগার শার্ক। নইলে এখানে যে ছোট ছোট হাঙ্গর আছে তারা মানুষকে এড়িয়েই চলে এবং প্রায় প্রতিদিনই জেলেদের জালে তাদের প্রজাতির কিছু ধরাও পড়ে এবং বাজারে বিক্রিও হয়। ভয় যে পেয়েছে রংকিনী তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয়টা পেল কী দেখে?

আলো যখন ছিল, তখন দেখেছিলেন যে একটা সার্পেন্ট-ঈগল-এর পায়ের দাগ জলের পাশ বরাবর ভেজা বালির উপরে উপরে গেছে ঐ দিকে, মানে রংকিনী যেদিকে সাঁতার কাটছিল। কোনও সার্পেন্ট ঈগলকে তটে নামতে দেখেননি উনি আজ অবধি। কোনও বড় সামুদ্রিক সাপকে কি দেখেছিল সে? সেই সাপই কি তাড়া করেছিল রংকিনীকে? না কি কোনও জিন-পরীই নেমে এল জলের মধ্যে রংকিনীর ক্ষতি করার জন্যে "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট" থেকে?

এমন এমন সময়ে আহুক ভীরাপ্পানের অভাব খুবই বোধ করেন। বুদ্ধিতে যা কিছুরই ব্যাখ্যা চলে না সেইসব দুরূহ প্রশ্নর জট ভীরাপ্পান এক নিমেষে খুলে জলবৎ-তরলং করে বুঝিয়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভীরাপ্পান আছে বলেই এই দ্বীপে তিনি একা আছেন অনায়াসে। প্রকৃতিকে তার ভাল মন্দ এবং অতিপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ সমেত ভীরাপ্পান যেমন বোঝে তিনি তেমন আদৌ বোঝেন না। কোনও জান্তব নারীরই মতো, জান্তব, সর্বগ্রাসী, ভয়ানক প্রকৃতিকে ভীরাপ্পানের মতো জান্তব এবং প্রকৃতি-লালিত ভয়ঙ্কর পুরুষই শুধু বশ করতে পারে।

রংকিনীর ঠোঁট নড়ল দুবার। এবার জ্ঞান ফিরবে মনে হচ্ছে। জ্ঞান ফিরলেই ওকে এক গ্লাস ওয়াইন দেবেন আস্তে আস্তে খেতে। ব্রান্ডি থাকলে ভাল হতো। কিন্তু আহুক সমস্ত কু এবং হয়ত সু অভ্যেসকেই কলকাতাতেই ছেড়ে এসেছেন। "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট"-এ এসে নিজের জীবনকে একেবারে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। এখানে আয়না থাকলে তাঁর হয়তো নিজেকে চিনতে পর্যন্ত কষ্ট হতো—যতটুকু তাঁকে আয়নাতে

দেখা যেত। আর যেটুকু তিনি আয়নাতে কখনওই প্রতিফলিত হয় না, হতো না, সেটুকুকে দেখতে রংকিনীর মতো কোনও নারীর চোখের আয়নার প্রয়োজন হতো।

পাছে জ্ঞান আসামাত্রই আহুকের সামনে ওর নগ্নতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় রংকিনী, তাই আহুক উঠে লক্ষণের গণ্ডির ওইদিকে চলে গেলেন। একটু পরই গলা শুনলেন রংকিনীর। কোথায়? আপনি কোথায়?

এই তো এখানে। কেমন আছ? ভাল তো এখন?

কোথায় গেছেন। শিগগির আসুন।

আহুক কাছে যেতেই রংকিনী তোয়ালেটা জড়িয়েই আহুকের বুকে এল। খুব জোরে জড়িয়ে ধরল আহুককে। তারপর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। আহুকের পিঠের উপর দিয়ে রংকিনীর দু'চোখের গরম জল বয়ে যেতে লাগল।

রংকিনী তাঁর পিঠে তার ছোট ছোট নরম মুঠি দিয়ে কিল মারতে মারতে বলল, আপনি খারাপ। খারাপ। ভীষণই খারাপ। খারাপ ...

আহুক অস্ফুটে বললেন, জানি তা।

সমুদ্রে জোয়ার লেগেছে। ঢেউয়েদের তটে আসা দ্রুততর হয়েছে। চাঁদে ভাসছে বিশ্বচরাচর। মাথার উপরে কালো, ভুতুড়ে, "দ্যা হর্ণেট্‌স নেস্ট" ছায়া ফেলেছে। আন্দামানী পেঁচাটা ডাকল গুডুম! গুডুম! গুডুম।।

আহুকের বুকের মধ্যেই কেঁপে উঠল রংকিনী ভয়ে।

খুবই ভাল লাগল আহুকের। পুরুষের চওড়া রোমশ বুকেই তো নারীর চিরকালীন আশ্রয়।

লক্ষণের গণ্ডির ওপাশে একটা একলা স্যান্ড-পাইপার কেঁদে বেড়াচ্ছিল। এ পাখিগুলোকে রাতে দেখা যায় না। সেও বুঝি সঙ্গী খুঁজছে।

রংকিনীর মুখটিকে দু'হাতের পাতাতে ধরে তার দুঠোঁটে দুঠোঁট রেখে আহুক বহু বছর বাদে কোনও নারীকে পরিপূর্ণভাবে চুমু খেলেন। সেই চুমু পরিপূর্ণতর করে ফিরিয়ে দিল রংকিনী।

কেন জানে না, রংকিনী, এই মানুষটার মধ্যে যে তার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে কেন খুঁজে পেল। যে-আদর, যে ভাল-ব্যবহার তাঁকে কখনও দেওয়া হয়নি, তাই যেন দেওয়ার জন্যে উদগ্রীব হল ও।

১২

খাওয়া-দাওয়া এবং অনেক আদর খাওয়া এবং করার পরে একটি বড় তোয়ালে পেতে ওঁরা দু'জনে শুয়েছিলেন। রংকিনী এমনভাবে আহুককে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যে আর ছাড়বে না তাঁকে কখনও।

আহুক জানেন যে, ও অপাপবিদ্ধা যুবতী। তাই জীবনের গতি-প্রকৃতিকে জানে না। মৃত প্রেমিককেও অন্য মানুষে প্রেমিকার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে নিয়ে যায়, মৃতবৎসা মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে আত্মীয়রা। সংসারে সব বাঁধনই খুলে দেবার জন্যেই। সেই মুক্তিই আসল প্রেম। যে মুক্তি রংকিনীর মা দিয়েছিলেন তার লেখক বাবাকে।

রংকিনী ঘুমিয়ে পড়ার পর আহুক উঠে সমুদ্রতটে পায়চারি করছিলেন। সেই বড় পেঁচারা ডাকল। অত উপর থেকে ডাকা সত্ত্বেও এই সমুদ্রপারের হু-হু হাওয়া আর ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে সেই ডাক কানে এল আহুক-এর। একজোড়া আছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যেতেই দাম্পত্য কলহ হয় একপ্রস্থ খুব জোর। তারপরই খুব ভাব। সব দাম্পত্যই এরকম।

কাল কী হবে জানেন না উনি। রংকিনী হয়ত ওঁর সঙ্গে ঘর পাততে চাইবে। কিন্তু তাতো হয় না। ও অনভিজ্ঞা বলেই তো অনেক পোড়-খাওয়া আহুক বোস ওকে ঠকাতে পারেন না। তবে রংকিনীর যখন চুল পেকে যাবে, দাঁত নড়ে যাবে, তখন যদি সে এখানে এসে থাকতে চায় তবে আহুক, যদি তিনি নিজে তখনও বেঁচে থাকেন, বাধা দেবেন না। আজকে ওঁর বয়সে পৌঁছে উনি যা জানেন, তা রংকিনীর বয়সে রংকিনী জানবেই বা কী করে!

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু এখন যা হয় না, তা হয় না। জীবন বড় আনরোম্যান্টিক। সকলের জীবনই। গল্প-উপন্যাসের কাহিনী খুব কম ক্ষেত্রেই জীবনে সত্যি হয়। আর হয় না বলেই মানুষ-মানুষী তা এতো ভালবেসে পড়ে, সারা রাত ধরে। কৃষ্ণমূর্তির কোনও লেখাতেই কি পড়েছিলেন আহুক অনেকদিন আগে? মনে পড়ছে না ঠিক :

"If you love something or someone, set it free. If it comes back to you, it is yours!

If it does not,

it was never meant to be!"

চাঁদের আলোটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। হাওয়াটাও জোর হচ্ছে। হাওয়াতে 'দ্যা

হর্ণেট্‌স নেস্ট'-এর হরজাই গাছ-গাছালির পাখ-পাখালির বৃষ্টি ভেজা গায়ের গন্ধ ভেসে আসছে।

এবারে রমিতা রংকিনীকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে কটেজে। ফুলশয্যার রাত যেমন চিরদিনেব নয়, ডাইনী-জ্যোৎস্নাতে আর সমুদ্রের জলে গা-ছমছম করা সিক্ততাতে অভিষিক্ত তটশয্যাও চিরদিনের নয়।

আজ সাবা রাত ধরে কী করে শরীরে আর মনে আতব মাখতে হয় তা ওকে শেখাবেন আন্টক। যৌবন যে বড় সুন্দর সময় এবং বড়ই ক্ষণস্থায়ী তা বোঝাবেন আন্টক রংকিনীকে।